ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও ধর্ষণের চেষ্টা

বাংলাদেশে নারী ও কন্যা নির্যাতন চিত্র ২০১৯

১৪টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত
নারী নির্যাতন বিষয়ক তথ্যের ভিত্তিতে
পরিচালিত সমীক্ষা

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপপরিষদ

বাংলাদেশে নারী ও কন্যা নির্যাতন চিত্রঃ ২০১৯

ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও ধর্ষণের চেষ্টা

বাংলাদেশে নারী ও কন্যা নির্যাতন চিত্রঃ ২০১৯

ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও ধর্ষণের চেষ্টা

সমীক্ষা পরিচালনা

রীণা আহমেদ

সম্পাদক

প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপপরিষদ

কেন্দ্রীয় কমিটি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

তথ্য বিন্যাস, তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

আফরুজা আরমান, গবেষণা কর্মকর্তা

তথ্য সংগ্রহ

শাহজাদী শামীমা আফজালী

সালেহা বানু

কাজী সিরাজুম্ মুনীরা

ঝর্ণা আক্তার

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

সুফিয়া কামাল ভবন

১০/বি/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০, ফোন ৯৫৮২১৮২, ফ্যাক্স ৯৫৬৩৫২৯

E-mail: info@mahilaparishad.org, Web: www.mahilaparishad.org

বাংলাদেশে নারী ও কন্যা নির্যাতন চিত্র ২০১৯: ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও ধর্ষণের চেষ্টা
State of violence against Women and Girl in Bangladesh 2019
Rape, Gang Rape & Attempt to Rape

প্রকাশকাল
২০২০

প্রকাশক
প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপ-পরিষদ
কেন্দ্রীয় কমিটি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
১০/বি/১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৮২১৮২ ফ্যাক্স: ৯৫৬৩৫২৯
E-mail: info@mahilaparishad.org
Web: www.mahilaparishad.org

প্রচ্ছদ ও গ্রফিক্স ডিজাইন
আবু সাঈদ তুহিন

প্রকাশনা সহযোগী
খলিল মজিদ
গৌতম বসাক

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমতি ব্যতীত এই গ্রন্থের কোন গ্রাফ
ছক ও প্রতিবেদন অন্যত্র প্রকাশ বা ব্যবহার করা যাবে না

State of violence against Women and Girl in Bangladesh 2019: Rape, Gang Rape & Attempt to Rape published by Training, Research, and Library Sub-committee, Bangladesh Mahila Parishad, Central committee.
10/B/1, Segunbagicha,Dhaka 1000, Phone: 9582182 Fax: 9563529
E-mail: info@mahilaparishad.org; Web: www.mahilaparishad.org

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ কথা : সীমা মোসলেম ৭
উপ-পরিষদ সম্পাদকের কথা : রীনা আহমেদ ৯

সার-সংক্ষেপ

প্রথম অধ্যায় : **ভূমিকা** ১৩
প্রেক্ষাপট
উদ্দেশ্য
যৌক্তিকতা
সীমাবদ্ধতা

দ্বিতীয় অধ্যায় : **গবেষণা পদ্ধতি** ১৫
কার্যকরী সংজ্ঞা
তথ্যের উৎস
মেয়াদ/সময়সীমা
গবেষণা সমগ্রক
তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি
তথ্য সংগ্রহের বিষয়
তথ্য যাচাইকরণ প্রক্রিয়া
প্রতিবেদন কাঠামো

তৃতীয় অধ্যায় : **তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ** ০০
পরিচ্ছদ ১ : **ধর্ষণ**
নির্যাতনের শিকার নারী
সম্পর্কে তথ্য
অভিযুক্ত সম্পর্কে তথ্য
ঘটনার সম্পর্কে তথ্য

পরিচ্ছদ ২ : **ধর্ষণের চেষ্টা** ০০
নির্যাতনের শিকার নারী
সম্পর্কে তথ্য
অভিযুক্ত সম্পর্কে তথ্য
ঘটনার সম্পর্কে তথ্য

পরিচ্ছদ ৩ : **গণধর্ষণ** ০০
নির্যাতনের শিকার নারী
সম্পর্কে তথ্য
অভিযুক্ত সম্পর্কে তথ্য
ঘটনার সম্পর্কে তথ্য

চতুর্থ অধ্যায় : **তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল** ০০

পঞ্চম অধ্যায় : **উপসংহার** ০০
সুপারিশসমূহ
তথ্যপঞ্জি

প্রসঙ্গ কথা

"নারীর অধিকার মানবাধিকার, নারী নির্যাতন মানবাধিকার লঙ্ঘন।" ১৯৯৩ সালে ভিয়েনা মানবাধিকার সম্মেলনে গৃহীত বিশেষ ঘোষণা সামগ্রিকভাবে সমাজে নারীর অবস্থানের চিত্র তুলে ধরে। সমাজে নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিনিয়ত নারীকে সহিংসতার সম্মুখীন করছে। চতুর্থ আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে গৃহীত বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনায় বলা হয়েছে, "জেন্ডারভিত্তিক যেকোনো ধরণের তৎপরতা, যার ফলে নারীর শারীরিক, যৌন অথবা মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয় ঘটে বা ঘটতে পারে। একই সঙ্গে এর দ্বারা বুঝানো হয় উল্লেখিত ধরণের তৎপরতা, দমন-পীড়ন বা অবাধে স্বাধীনতা হরণের হুমকি যা জনজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রেই সৃষ্টি করা হয় বা করা হতে পারে"। বেইজিং ঘোষণার এই সংজ্ঞার মাধ্যমে ধারণা করা যায় সমাজে নারী নির্যাতনের পরিধি কত ব্যাপক। নারী ও কন্যা কতভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

"নারী ও কন্যা নির্যাতন চিত্র-২০১৯ (ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও ধর্ষণের চেষ্টা) শীর্ষক সমীক্ষাটিতে তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। নারী ও কন্যার জন্য কোন স্থানটি নিরাপদ? গৃহ–যাকে মনে করা হয় ব্যক্তির নিরাপদ আশ্রয়স্থল–সেই গৃহকোণও নারীর জন্য নিরাপদ নয়। ৮৭ শতাংশ নারী পারিবারিক সহিংসতার শিকার হচ্ছে। একজন কন্যাসন্তান যখন সে পড়াশোনা করতে যাচ্ছে তখন গৃহ থেতে শুরু করে প্রতিটি পদক্ষেপেই তাকে সহিংসতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। কন্যা শিশু, কিশোরী, ছাত্রী, গৃহকর্মী, শ্রমজীবী, পেশাজীবী নারীরা আজকে ঘরে-বাইরে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কর্মক্ষেত্রে, পথে, বাজারে সকলক্ষেত্রে নতুন মাত্রায় যৌন হয়রানী, উত্ত্যক্তকরণ ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। যার নেতিবাচক প্রভাব সমাজ ও জাতীয় উন্নয়নে পড়ছে।

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার পথে নানা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কিন্তু নারী সে প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে অগ্রসর হচ্ছে। সমাজে সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাচ্ছে ও দৃশ্যমান হচ্ছে। সমাজে নারীর অবস্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে নারীর প্রতি নির্যাতনের ধরণও পরিবর্তিত হচ্ছে। সমাজে এর প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রেও ঘটছে নানা পরিবর্তন। নির্যাতনের প্রতিরোধে অনেক ক্ষেত্রে নারী গ্রহণ করছে সাহসী ভূমিকা আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নারী আত্মহননের মতো পথও বেছে নিচ্ছে। যার দ্বারা নারী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে সেখানেও ঘটছে পরিবর্তন। যুবক ও তরুণ সমাজ নির্যাতনকারী হিসেবে আর্বিভূত হচ্ছে পূর্বের তুলনায় অধিক হারে– যা বিশেষ উদ্বেগজনক। ফলে দেখা যাচ্ছে নারী নির্যাতনের শিকার হয়ে যে কেবল নারী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা নয়, যে তরুণ ও যুবক এই নির্যাতনের ঘটনা ঘটাচ্ছে তাঁদের জীবনও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠছে যার প্রভাব পড়ছে গোটা সমাজে। নারী নির্যাতন শুধুমাত্র নির্যাতনের ঘটনা নয়। এটি একটি সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ। পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে এই মূল্যবোধ পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলছে মহিলা পরিষদ। মহিলা পরিষদের বহুমাত্রিক কাজের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও এক্ষেত্রে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলা। এ কাজে মহিলা পরিষদ একদিকে যেমন নির্যাতনের শিকার নারীর পাশে দাঁড়াচ্ছে, আইনগত ক্ষেত্রে থেকে শুরু করে চিকিৎসা, আশ্রয়সহ সকল ধরণের সহায়তা প্রদান করছে, তাকে সাহস প্রদান করছে ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর নৈতিক সমর্থন যোগাচ্ছে। অন্যদিকে, প্রচলিত আইনে নারীর অধিকারের ক্ষেত্রগুলো নিরীক্ষণ করছে, বিদ্যমান ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করছে এবং নতুন আইন প্রণয়নের জন্য আন্দোলন

গড়ে তুলছে। প্রয়োজনীয় আইনের খসড়া প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রদান করছে। আইন বাস্তবায়নে রাজপথে আন্দোলন গড়ে তুলছে ও সরকারের সাথে অ্যাডভোকেসি ও লবি করছে।

প্রতিটি রিপোর্ট নিরীক্ষণ করে, এ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের কাজটি বিশেষ শ্রমসাধ্য। এ কাজটি করেছেন শাহজাদী শামীমা আফজালী, সালেহা বানু ও কাজী সিরাজুম মুনীরা। সমীক্ষাটির তথ্য বিন্যাস ও টেবিল তৈরি করেছে সিনিয়র প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কর্মকর্তা শাহজাদী শামীমা আফজালী এবং তথ্য বিশ্লেষণ ও রিপোর্ট প্রণয়ন করেছেন গবেষণা কর্মকর্তা আফরুজা আরমান। প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপপরিষদের সম্পাদক রীনা আহমেদ কাজটি সম্পাদনে সহযোগিতা করেছেন। মহিলা পরিষদের লিগ্যালএইড উপপরিষদের সদস্যদের সহযোগিতায় উপপরিষদে সংরক্ষিত সংবাদপত্রগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সমীক্ষাটি সম্পাদন সম্ভব হয়েছে ।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কাজের অংশ হিসেবে এই সমীক্ষাটি পরিচালনা করা হয়েছে। এখান থেকে প্রাপ্ত তথ্য ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও এডভোকেসির কাজ পরিচালনায় সহায়তা করবে। যদিও এই সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তারপরেও ২০১৯-এর নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার চিত্র এখানে পাওয়া যায়।

সীমা মোসলেম
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
কেন্দ্রীয় কমিটি
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

উপপরিষদ সম্পাদকের কথা

নারীর প্রতি ক্রমবর্ধমান সহিংসতা একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হচ্ছে, যা শুধুমাত্র সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপই নয়, বরং নারী-পুরুষের বৈষম্যগুলো কমানোর ক্ষেত্রে অর্জনগুলোকেও ঝুঁকিতে ফেলছে। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন হলেও শুধুমাত্র আইন দিয়ে নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব নয়। এজন্য নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করতে হবে। নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও তা বিলোপের আন্দোলন অব্যাহতভাবে মহিলা পরিষদ পরিচালনা করছে। এই ধারাবাহিক আন্দোলনের বহুমুখী কর্মসূচির অন্যতম হচ্ছে নারী নির্যাতন বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ। এর মধ্য দিয়ে নারী নির্যাতনের ধরন, মাত্রা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা লাভ সম্ভব। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও নির্মূলে আন্দোলনের সময়োপযোগী ও বাস্তবমুখী কর্মসূচি প্রণয়ন ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দেশের নারী নির্যাতন চিত্র সম্পর্কে জানা খুবই জরুরি।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপপরিষদের পক্ষ থেকে **বাংলাদেশে নারী ও কন্যা নির্যাতন চিত্র ২০১৯: ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও ধর্ষণের চেষ্টা** শীর্ষক সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। ২০১৯ সালের ১৪টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত নারী নির্যাতন বিষয়ক ঘটনাগুলোর তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণে নির্যাতনের ধরন, নির্যাতনের শিকার নারীর বয়স, পেশা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, নির্যাতনকারীর পরিচয়, নির্যাতনের প্রভাব, জনসমাজে নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া, আইনের অবস্থানসহ বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

কেবলমাত্র পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করার কারণে গবেষণায় কিছুটা সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। সমস্ত সীমাবদ্ধতার পরও বলা যায় পরবর্তীতে নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে গবেষণা করার ক্ষেত্রেও এ সমীক্ষাটি ফলপ্রসু ভূমিকা রাখবে।

সমীক্ষাটি সার্বিকভাবে পরিচালনা করেছেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম। তাঁকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

সমীক্ষাটি পরিকল্পনা প্রণয়ন, তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করে গবেষণা কাজটি সম্পাদনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন গবেষণা কর্মকর্তা আফরুজা আরমান। তাঁকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। তথ্য সংগ্রহের কাজটি করেছেন শামীমা শাহজাদী আফজালী, সালেহা বানু ও কাজী সিরাজুম মুনীরা। তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

সবশেষে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের লিগ্যালএইড উপপরিষদের সদস্যদের, তাঁদের সহযোগিতায় উপপরিষদে সংরক্ষিত সংবাদপত্রগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সমীক্ষাটি সম্পাদন সম্ভব হয়েছে ।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কাজে যাঁরা যুক্ত আছেন, এই সমীক্ষাটি তাঁদের কাজে ব্যবহৃত হলে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সার্থকতা অর্জন হবে।

রীনা আহমেদ
সম্পাদক
প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপপরিষদ
কেন্দ্রীয় কমিটি
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

সারসংক্ষেপ

নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। নারী-পুরুষের সমতা, মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হ্রাস, নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ নানা সূচকে নারীর অগ্রগতিতে নানা বৈশ্বিক স্বীকৃতি পেয়েছে। যেসব সূচকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়ার উদাহরণ পাওয়া গেছে তার বেশির ভাগই নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলেই অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা অর্জনগুলোকে বাধাগ্রস্ত করছে ও ঝুঁকিতে ফেলছে। এ সহিংসতা বাড়ছে উদ্বেগজনক হারে। ধর্ষণ, গণধর্ষণ, খুন, অপহরণ অনেকটা ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও এ অনাকাক্ষিত পরিস্থিতির শিকার হতে হচ্ছে কোনো না কোনো তরুণী, কিশোরী, নারী ও শিশুকে।

নারীরা সমাজে দু'ভাবে নির্যাতনের শিকার হয়। একদিকে সামগ্রিকভাবে সমাজের যে বিন্যাস সেক্ষেত্রে নিপীড়িতদের একজন হিসেবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, অন্যদিকে কেবল নারী হবার কারণে প্রতিনিয়ত তাকে নানা নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হতে হয়, যাকে লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন বলা হয়। নারীর উপর এই নির্যাতনসমূহ সংঘটিত হয় রাষ্ট্রিক, সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিকভাবে।

সংবাদপত্রের পাতায় অথবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নারী ও শিশুকে পাশবিক নির্যাতন (ধর্ষণ), হত্যা, গুম, অপহরণের খবর প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের লিগ্যালএইড উপপরিষদ কর্তৃক সংরক্ষিত ১৪টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সংবাদের ওপর ভিত্তি করে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়, যার চিত্র খুবই ভয়াবহ ও উদ্বেগজনক।

২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়সীমায় মোট ১,৭৮৪ জন নারী ও শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ধর্ষণ ১,৩৯১টি, গণধর্ষণ ১৮২, ধর্ষণের চেষ্টা ২১১টি। ২০১৮ সালে এই সংখ্যা ছিল ১,০০৭টি। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় ২০১৯ সালে প্রায় দ্বিগুণ নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

নির্যাতনের ধরণ	নারী	কন্যা
ধর্ষণ	২৩০	৫৭০
গণধর্ষণ	১৪৭	১১৪
ধর্ষণের চেষ্টা	৮৮	১৫৭
মোট	৪৬৫	৮৪১

নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যার **বয়সের ক্ষেত্রে** দেখা যায় ৫ বছর কিংবা তার কম বয়সের শিশু কন্যাও যেমন ধর্ষণের শিকার হয়েছে তেমনি ৫০ উর্দ্ধ নারীও নিস্তার পায়নি এই সহিংসতার হাত থেকে। নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অধস্তন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ এখানে ফুটে উঠেছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রায় অর্ধেক ক্ষেত্রে ঘটনার শিকার নারীর বয়স উল্লেখ থাকে না। যাদের বয়স উল্লেখ করা আছে তাদের মধ্যে দেখা যায়, **নারীর তুলনায় কন্যারা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে বেশি। এদের বড় অংশেরই বয়স ১০ বছরের মধ্যে।** ধর্ষণ ও ধর্ষণের চেষ্টা উভয় ক্ষেত্রে ৬-৯ বছর বয়সের কন্যারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে বেশি, যথাক্রমে তা ১৮% ও ১১%। গণধর্ষণের ক্ষেত্রে, ১৪-১৮ বছর বয়সের কন্যারা (২৫%) নির্যাতনের শিকার হচ্ছে বেশি। এসময় তার শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে, মানসিক বিকাশ ঘটে। এ বয়সেই যদি একজন কন্যা

গণধর্ষণের মতো পৈশাচিক নির্যাতনের শিকার হয় তবে তার শারীরিক অবস্থার সাথে সাথে মানসিক গঠনও পুরোপুরিভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, সংখ্যায় কম হতে পারে, কিন্তু ২-৫ বছরের শিশুও এই নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পায়নি। অপরদিকে, প্রাপ্তবয়স্ক নারীর ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রাপ্ত তথ্যের প্রায় অর্ধেকের বেশি নারী, সাধারণত যারা বয়সে তরুণী অর্থাৎ ১৮-৩০ বছর বয়সের নারীরা, সবচেয়ে বেশি ধর্ষণ, গণধর্ষণসহ যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন ।

নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যার **শিক্ষাগত যোগ্যতা** বিশ্লেষণে দেখা যায়, **স্কুল পর্যায়ের কন্যারা সবচেয়ে বেশি যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।** বিশেষত ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণিতে পড়ছে এমন কন্যার সংখ্যাই বেশি। ধর্ষণের ক্ষেত্রে ১ম-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ১৫% এবং ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেনি পর্যন্ত ২০% নারী নির্যাতনের শিকার। ধর্ষণের চেষ্টার ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়, ঘটনার শিকার কন্যা ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ১৫%, ১৮% কন্যা ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণির মধ্যে অধ্যয়নরত। অপরদিকে, গণধর্ষণের ক্ষেত্রে দেখা যায় মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত অর্থাৎ ৬ষ্ঠ- ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করছে তাদের সংখ্যাটা বেশি। উল্লেখ্য যে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে সাধারণত কর্মজীবী নারী ও গৃহিণীর শিক্ষাগত যোগ্যতার উল্লেখ থাকে না।

সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে লক্ষ্য করা যায় ধর্ষণের শিকার নারীর বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। ২-১৩ বছরের কন্যা সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের শিকার এবং এরই বড় একটা অংশ ১০-১৩ বছর বয়সে নির্যাতনের শিকার হয় বেশি। অপরদিকে একই চিত্র লক্ষ্য করা যায় শিক্ষার ক্ষেত্রেও। ১ম-১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ধর্ষণের শিকার কন্যার হার বেশি এবং যার মধ্যে ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণি পড়ুয়া কন্যাদের সংখ্যা বেশি। সমাজে বিদ্যমান লিঙ্গ বৈষম্য কাটিয়ে উঠে জেন্ডার সমতার জন্য নারী শিক্ষার পরিধি বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক। কিন্তু ক্রমবর্ধমান নারী ও কন্যার প্রতি যৌন নির্যাতন পরিস্থিতি এক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে।

নারীর মর্যাদার ক্ষেত্রে পেশাগতভাবে তেমন মৌলিক পার্থক্য নেই। যার কারণ হলো নারীর প্রতি পুরুষের অধস্তন দৃষ্টিভঙ্গী। এর যথার্থতা লক্ষ্য করা যায় নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যার পেশাগত তথ্য থেকে। কেননা স্কুল পড়ুয়া ছাত্রী থেকে শুরু করে সকল পেশায় চাকুরিজীবী নারী ধর্ষণের মতো ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার। নারী হওয়াটাই যার একমাত্র কারণ। সমীক্ষায় দেখা যায়, অপ্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বেশির ভাগই হল ছাত্রী। ধর্ষণের ক্ষেত্রে তা ৬৪% এবং গণধর্ষণের ক্ষেত্রে ৫২%। গার্মেন্টসকর্মী, বিভিন্ন কারখানার শ্রমিক ও গৃহপরিচারিকা লক্ষণীয়ভাবে নির্যাতনের ঝুঁকিতে রয়েছে।

কাজের সূত্রে ঘরের বাইরে বের হলে কর্মজীবী নারীরাই সহিংসতার শিকার বেশি হবে তা নয়। বরং সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, পরিবার বা ঘরের মতো সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থলে নারীরা সবচেয়ে বেশি অনিরাপদ ও সহিংসতার শিকার হচ্ছে। নারী কোথাও নিরাপদ নয়–না ঘরে, না বাইরে। কেননা প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও ধর্ষণের চেষ্টা সকল ক্ষেত্রে গৃহিনীরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। ধর্ষণের ক্ষেত্রে তা ৩২%, গণধর্ষণের ক্ষেত্রে ৩৭% এবং ধর্ষণের চেষ্টায় ৪৬%।

পেশা, বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণ করে বলা যায় সকল বয়স ও পেশার নারীরা কমবেশি ধর্ষণের শিকার হলেও **একটি নির্দিষ্ট বয়সের নারীরা, যারা পেশায় ছাত্রী এবং বয়স তুলনামূলকভাবে কম, বেশি ধর্ষণের**

মত যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

ধর্ষণের সকল ঘটনা প্রকাশিত হয় না। কিছু ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নির্যাতনের ঘটনা গ্রামে না শহরে বেশি, তার চেয়ে বেশি উদ্বিগ্নের বিষয় হল বাংলাদেশের সর্বত্রই নারী ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্যাতনের শিকার নারীর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, **নির্যাতনের শিকার অধিকাংশ নারী হচ্ছে উপজেলা ও গ্রামে বসবাসকারী।** ধর্ষণের ক্ষেত্রে অর্ধেক ঘটনাই সংগঠিত হয়েছে উপজেলা পর্যায়ে ৫০% ও গ্রাম এলাকায় ২৬%। গণধর্ষণের ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে ৪৬% ও গ্রাম পর্যায়ে ২২% এবং ধর্ষণের চেষ্টায় উপজেলায় ৪৪% ও গ্রাম এলাকায় ২৯%।

বর্তমানে ভয়াবহ হারে বেড়ে চলেছে নারী ও কন্যার ওপর ধর্ষণের ঘটনা। বেশির ভাগ ঘটনার শিকার হচ্ছে কন্যা। **বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নারী বা কন্যা ধর্ষণের শিকার হয় পরিচিত মানুষজন, নিকট আত্মীয়দের ও প্রতিবেশীদের দ্বারা।** প্রতিবেশীদের দ্বারা একটি বড় অংশ কন্যা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে, এ হার ধর্ষণের ক্ষেত্রে ৪৫% গণধর্ষণের ক্ষেত্রে ১৮%, এবং ধর্ষণের চেষ্টার ক্ষেত্রে ২৪%। প্রতিবেশীদের হাতে ধর্ষণের শিকার শিশুদের বয়স তুলনামূলক কম। দুই বছরের কম বয়সের শিশুও প্রতিবেশী দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, **প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। কিশোরীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এ ধরনের ঘটনার শিকার।** ধর্ষণের ক্ষেত্রে ১৫%, গণধর্ষণের ক্ষেত্রে ১১% এবং ধর্ষণের চেষ্টার ক্ষেত্রে ৯% কন্যারা তাদের সহপাঠী ও প্রেমিকদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়েছে। কিশোরীরা পরিবারের গন্ডি পেরিয়ে, স্মার্টফোন, সহজলভ্য ইন্টারনেটের কারণে প্রেমের সর্ম্পকে জড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে বিয়ের প্রলোভনে বা আবেগের ফাঁদে পড়ে ধর্ষণের শিকার হয়।

তাছাড়াও স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে প্রেমের প্রস্তাব বা বিয়ের প্রস্তাবে রাজী না হওয়া বা কোন কুপ্রস্তাবে সাড়া না দেয়ার কারণে, বিয়ে বা চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে, জোরপূর্বক নারী বা কন্যারা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে এলাকার বখাটে ও সন্ত্রাসী, স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যাক্তি বা অপরিচিতজনদের দ্বারা। **গণধর্ষণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বেশির ঘটনার (২৭%) অভিযুক্ত হচ্ছে এলাকার বখাটে ও সন্ত্রাসী, যা সবোর্চ্চ।**

ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তদের বয়সের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কিশোর থেকে শুরু করে ষাটোর্ধ্ব পুরুষও রয়েছে অভিযুক্তের তালিকায়। প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, **ধর্ষণের মত নির্যাতনে তরুণ সমাজের সম্পৃক্ততা বেশি। ১১-৩০ বছর বয়সের মধ্যে মোট ৩২% অভিযুক্ত, বিশেষ করে ২১-২৫ বছর বয়সে সবচেয়ে বেশি। গণধর্ষণকারীর প্রায় অর্ধেকের বেশির বয়স ১৬ থেকে ৩০ বৎসরের মধ্যে (৪৮%)।** তথ্য প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহার, সহজলভ্য ইন্টারনেট, স্মার্টফোন ও সর্বোপরি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এসব কিছুতে সবচেয়ে বেশি বিচরণ করে তরুণসমাজ। তাই ঝুঁকিটাও বেশি। যার ফলে তরুণ সমাজের নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটচ্ছে এবং তারা ধর্ষণের মত জঘন্য অপরাধসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। যে তারুণ্য পরিবার, দেশ ও সমাজকে প্রযুক্তির ছোঁয়ায় উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়ার কথা, আজ তাদের একটা বড় অংশ ধর্ষণের মত নির্যাতনে সম্পৃক্ত হচ্ছে।

তাছাড়াও **ধর্ষণের শিকার নারী ও কন্যার বয়স ও অভিযুক্তের বয়সের পাশাপাশি তুলনা করলে দেখা যায়, যারা পেশায় ছাত্রী এবং বয়সে তরুণী অর্থাৎ ২৫ বছর বয়সের মধ্যে তারাই সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের মত যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। অপরদিকে ধর্ষণের ঘটনায় তরুণদের সম্পৃক্ততা সবচেয়ে বেশি, যাদের বয়স ১৬-৩০ বছরের মধ্যে।** এ ধরণের ভয়াবহ চিত্র উদ্বেগজনক।

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, নারী ও কন্যা প্রতিবেশী, নিজ আত্মীয়-স্বজন অর্থাৎ পরিচিতজনদের দ্বারাই বেশি

শিকার হচ্ছে। অন্যদিকে, **ধর্ষণের ক্ষেত্রে অভিযুক্তের পেশা বিবেচনায় দেখা যায় সবচেয়ে বেশি চালক ৭%, ক্ষুদ্র** ব্যবসায়ী (মুদি দোকানদার, স্টেশনারি বিক্রেতা ইত্যাদি) ৬%, শিক্ষক ৪% ও এলাকার বখাটে ৫%, যা তাদের পরিচিত গণ্ডির মধ্যেই থাকে। শিক্ষক দ্বারা ধর্ষণের চেষ্টার শিকার ১৩% কন্যা। গণধর্ষণ, যেখানে কয়েকজন সংঘবদ্ধভাবে ক্ষমতারজোরে এই ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। কন্যা ও নারী সবচেয়ে বেশি গণধর্ষণের শিকার হয়েছে শ্রমিক ও স্থানীয় বখাটে বা সন্ত্রাসীদের দ্বারা ১২% এবং রাজনীতির সাথে জড়িত ব্যাক্তি ৪%। অর্থাৎ স্কুলে বা বাইরে যাওয়া-আসার পথে বখাটে বা পরিবহন চালক, এমনকি বিদ্যালয়ে যিনি শিক্ষা দিবেন প্রক্যেতটি ক্ষেত্র কন্যা ও নারীর জন্য সবচেয়ে বেশি অনিরাপদ ও ভয়ংকর ঝুকিপূর্ণ। যা খুবই উদ্বেগজনক, কেননা এটি নারীর ক্ষমতায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে।

যেকোনো নির্যাতনের শিকার নারীদের উপর নির্যাতনের প্রভাব বিভিন্নভাবে পড়ে। নানা ধরণের প্রভাব পড়ে যেমন শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক। ধর্ষণের কারণে শারীরিকভাবে আহত হওয়া, এমনকি ধর্ষণের পর হত্যা করা, অন্তসত্ত্বা হওয়া ইত্যাদি প্রভাব উল্লেখযোগ্য। যা ধর্ষণের শিকার নারী ও কন্যাদের স্কুল, কলেজে বা কর্মক্ষেত্রে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তির কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আবার সামাজিকভাবে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যেমন– লোকলজ্জার ভয়ে বাইরে যাওয়া বা পড়াশুনা বন্ধ, কুৎসা রটনা, বিয়ের সমস্যা ইত্যাদি। ফলস্বরূপ বাল্যবিয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় যা নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রতিবন্ধক।

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ধর্ষক শুধু ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয় না, ধর্ষণের শিকার নারী ও তার পরিবারের উপর চালায় আরও নানা ধরনের অমানবিক নির্যাতন। ভিকটিম ও তার পরিবারকে সরাসরি হুমকি ও ভয়-ভীতি প্রদান, মামলা করার ফলে মারধোর, হামলার শিকার, থানা ও পুলিশের পক্ষ থেকে অসহযোগিতা এবং স্থানীয় জনগণের পক্ষ থেকে অসহযোগিতা এবং রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের ক্ষমতার প্রভাব প্রভৃতি কারণে নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যা মানসিক ট্রমার সৃষ্টি হয়। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে ও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, আত্মহত্যার চেষ্টা করে। নারীর প্রতি নির্যাতনের ধরণগুলো সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহার করে ধর্ষণের দৃশ্যগুলো ভিডিও করে নারীকে ব্লাকমেইল করছে। যাতে ভিকটিম মানসিক ও সামাজিকভাবে আরও বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। ধর্ষণের শিকার নারীর উপরে সকল ধরণের প্রভাব একই সঙ্গে পড়ে। একটি বিশেষ ক্ষেত্রেই ধর্ষণের প্রতিক্রিয়া রয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। সামগ্রিকভাবে সারাজীবন নারীর সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

সমীক্ষায় দেখা যায় ধর্ষণের ঘটনার বিশ্লেষণে আইনগত ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক দিক লক্ষ্য করা হয়। তা হচ্ছে বেশির ভাগ ঘটনায়ক্ষেত্রে ধর্ষণের মামলা হয়েছে এবং খুব সামান্য ক্ষেত্রে মামলা হয়নি। কিন্তু ঘটনার মামলা হওয়াটাই কি যথেষ্ট? যদি তাই হতো নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেত না। প্রতি বছর নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার হার বৃদ্ধি পাবার উল্লেখযোগ্য কারণ হল, বিচারহীনতা ও বিচারপ্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা। প্রতিবছর যে পরিমাণ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে, সে তুলনায় বিচারের হার অত্যন্ত কম। অনেকের বিরুদ্ধে আদালতে মামলাই হয় না। অনেক ধর্ষণের ঘটনায় ধর্ষণের শিকার নারী ও তাঁর পরিবার সামাজিক সম্মানহানির আশঙ্কায় তা প্রকাশ করে না। ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধ করেও অপরাধী ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয় না, অধিকাংশ ধর্ষক শাস্তি পায় না। তাদের বিরুদ্ধে মামলা বা গ্রেফতার করা হলেও তারা বিচার ও শাস্তি এড়িয়ে চলাচল করছে।

বাংলাদেশে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মামলা তদন্ত প্রক্রিয়ায় ধর্ষণের মেডিকেল রিপোর্ট ও আইনজীবীর অনাগ্রহ বা পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে চূড়ান্ত রায়ে মামলার নিষ্পত্তি হয়ে যায়। আইনগতভাবে তদন্ত কর্মকর্তাদের ৯০ দিনের

মধ্যে তদন্ত শেষে চূড়ান্ত চার্জ দেওয়ার কথা থাকলেও পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে অথবা প্রভাবশালী মহলের চাপ থাকায় মামলার চার্জশিট সঠিক সময়ে দেওয়া হয় না। আবার মামলার চার্জশিটের ভূল ব্যাখার কারণেও ভুক্তভোগী নারী ও শিশু ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন। অন্য সবধরণের অপরাধের বিচারে দীর্ঘসূত্রতার সঙ্গে তুলনা করে দেখা যায়, নারীদের মামলাগুলোর বিচার হতেই বেশি সময় লাগছে। **বিচারহীনতার দিক থেকে নারীরাই সব থেকে বেশি পিছিয়ে আছেন।**

বিভিন্ন ধরনের নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণ/নারী /সামাজিক/সাংস্কৃতিক সংগঠন ও দায়িত্ববাহকদের ইতিবাচক ভূমিকা:

- স্থানীয় জনগণ চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে নির্যাতনের শিকার নারীকে উদ্ধার/উদ্ধার চেষ্টা করে।
- স্থানীয় জনগণ অভিযুক্তকে পুলিশে সোপর্দ করেছে।
- নির্যাতনের শিকার নারীর পরিবারকে খবর দেয়।
- অভিযুক্তের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন সমাবেশ করে।
- স্থানীয় নারী ও মানবাধিকার সংগঠনের সমাবেশ।
- পুলিশ কর্মকর্তা নিজ উদ্যোগে অভিযুক্তকে গ্রেফতারের ব্যবস্থা করে।
- সহপাঠী বা ছাত্ররা বিচারের দাবিতে মানববন্ধন, স্কুল বা মাদ্রাসায় তালা ঝুলিয়ে দেয়াসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
- ইউ.পি চেয়ারম্যান কর্তৃক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।

ধর্ষণের ঘটনায় কোনো সালিশ বা মীমাংসা হতে পারে না। এটি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তারপরও আমাদের সমাজে ধর্ষণের ঘটনায় সালিশ ব্যবস্থা গ্রহণ বা সামাজিকভাবে মীমাংসা করতে দেখা যায়। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ ধরনের সালিশে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার চেয়ে ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হয় বেশি। কখনও ধর্ষকের সাথে নির্যাতনের শিকার নারী বা কন্যার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। টাকার মাধ্যমে বিষয়টি মীমাংসা করা এবং স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের প্রভাবে মামলা না করার জন্য ভিকটিমের পরিবারকে জোর করা হয়। অন্যদিকে, নারী ও মানবাধিকার সংগঠন, প্রশাসন ও স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে স্থানীয়ভাবে নানা ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হয় যেমন এলাকায় সমাবেশ করা, বৈঠক বসানো, থানায় রিপোর্ট করা, অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের, অনেক ক্ষেত্রে ধর্ষণকারীকে ধরিয়ে দেয়া ইত্যাদি। যদিও এ ধরণের পদক্ষেপ একেবারেই ন্যূনতম সংখ্যক, তারপরও বলা যায় এ ধরনের পদক্ষেপ নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সমাজে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করবে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে, **ধর্ষণের শিকার নারী, স্থানীয় জনগণ ও অভিভাবকদের মধ্যেও সচেতনতা বাড়ছে।**

নারী নির্যাতনের জন্য বিভিন্ন আইন থাকলেও দেখা যায় আইনী ব্যবস্থা গ্রহণে নির্যাতনের শিকার নারী বা তার পরিবার অনুৎসাহী, কখনো বা সামাজিক লোকলজ্জা, কখনোবা আইনী জটিলতা, ন্যায়বিচার না পাওয়া, অভিযুক্তের হুমকি, প্রভাবশালীদের প্রতাপ - এ সকল বিষয়ই অনুৎসাহের কারণ। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ছেড়ে দেয়ার মত ঘটনাও ঘটছে যা অপরাধীকে পুনরায় অপরাধে উৎসাহী করে তোলে এবং অন্যকে অপরাধ করতে সাহসী করে তোলে।

যেকোনো অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীর আত্মীয়-স্বজন বা অভিভাবকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অভিযুক্তকে তারা প্রশ্রয় দিলে অভিযুক্ত পুনরায় অপরাধ করার সাহস পায়। কিন্তু শাসন করলে বা প্রশ্রয় না দিলে অভিযুক্ত আর সাহস পায় না। ধর্ষণের ক্ষেত্রেও সামাজিকীকরণের ভূমিকা

আছে। জন্মের পর থেকেই পরিবার, স্কুল কিংবা বৃহৎ সামাজিক কাঠামোতে নারীর এবং পুরুষের আলাদা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া জড়িত। সামাজিকীকরণের ভিন্নতার কারণে নারী ও পুরুষের মর্যাদা বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গিও ভিন্নভাবে গড়ে ওঠে। ফলে পিতৃতান্ত্রিক এই সমাজব্যবস্থায় পুরুষেরা বড় হয়ে ক্ষমতা কাঠামোর কেন্দ্র হয়ে ওঠেন। আর এই আধিপত্যবাদী মানসিকতার কারণে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বাড়তে থাকে। এই ক্রমবর্ধমান সহিংসতার কারণে আমরা যতটা নারী ও কন্যাদের নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হচ্ছি ঠিক ততটাই ভাবতে হবে পরিবারের পুরুষ বা ছেলে সন্তানকে নিয়ে। কেননা, পরিবার হতে প্রাপ্ত নৈতিক মূল্যবোধ ও নারীর প্রতি সম্মান দেওয়া সর্বোপরি জেন্ডার সংবেদনশীলতার শিক্ষাই পারে নারী ও কন্যার প্রতি সহিসংতা প্রতিরোধ করতে এবং নারীর প্রতি অধস্তনতামূলক প্রথা ভেঙ্গে নারী-পুরুষের সমমর্যাদা ও সমতাভিত্তিক সমাজ তৈরি করতে।

বিভিন্ন ধরনের নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণ/নারী /সামাজিক/সাংস্কৃতিক সংগঠন ও দায়িত্ববাহকদের নেতিবাচক ভূমিকা:

- থানা বা পুলিশ মামলা নিতে চায় না বা সময় নষ্ট করে।
- রাজনৈতিক ব্যক্তি বা প্রভাবশালী ব্যক্তির বিভিন্ন হুমকি।
- অভিযুক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তি বা প্রভাবশালী ব্যক্তি হলে পুলিশ মামলা করার ক্ষেত্রে অসহযোগিতা করে ।
- রাজনৈতিক ব্যক্তি বা প্রভাবশালী ব্যক্তি মীমাংসার নাম করে সময়ক্ষেপণ করে অথবা মামলা করতে দিতে চায় না ।
- প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ সালিশের নাম করে নির্যাতনের শিকার নারীর বিরুদ্ধে রায় প্রদান করে।
- প্রভাবশালীরা সালিশের নাম করে অভিযুক্তকে জরিমানা করলেও বেশিরভাগ কেইসে সে টাকা সে পায় না, কিন্তু সেক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থাও নেয়া হয় না।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা
সমীক্ষা পদ্ধতি

প্রেক্ষাপট

ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে উন্নয়নশীল থেকে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে উত্তরণের পথে বাংলাদেশ। দেশকে মধ্যম আয়ের দেশের পথে এগিয়ে নিতে নারীর অবদান অনস্বীকার্য। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আজ যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সূচকে এগিয়ে চলেছে, তা সম্ভব হচ্ছে সর্বত্র নারীর সম্পৃক্ততার কারণে। শহরাঞ্চলের পোশাক কারখানার নারী শ্রমিক থেকে শুরু করে গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা নারী দেশের প্রচলিত সংস্কৃতিকে অনেকটাই বদলে দিচ্ছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির পাশাপাশি এ সময়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন সামাজিক সূচকেও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে ।

নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সর্বশেষ বৈশ্বিক লিঙ্গবৈষম্য প্রতিবেদনে নারী-পুরুষের সমতার দিক দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম বাংলাদেশ। তাছাড়াও শুধু দক্ষিণ এশিয়া নয়, মাতৃ ও শিশুমৃত্যু কমানোসহ সামাজিক নানা সূচকে নারীদের অগ্রগতিতে নানা বৈশ্বিক স্বীকৃতি মিলেছে। এমনকি কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেসব সূচকে বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার উদাহরণ দিয়েছেন তার বেশির ভাগই নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলেই তা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা অর্জনগুলোকে বাধাগ্রস্ত করছে ও ঝুঁকিতে ফেলছে। এ সহিংসতা বাড়ছে উদ্বেগজনক হারে। ধর্ষণ, গণধর্ষণ, খুন, অপহরণ অনেকটা ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও এ অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির শিকার হতে হচ্ছে কোনো না কোনো তরুণী, কিশোরী, মহিলা ও শিশুকে। ধর্ষণের কবল থেকে বাদ পড়ছে না ৭০ বছরের বৃদ্ধাও। নারী ও কন্যা প্রতি সহিংসতা রোধ না করতে পারলে, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম এজেন্ডা 'জেন্ডার সমতা' অর্জন সম্ভব নয় এবং সর্বোপরি উন্নয়নের জন্য চ্যালেঞ্জে হয়ে দাঁড়াবে।

পরিবারে ও সমাজে সমঅধিকার আর মর্যাদা নিশ্চিত না হলে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা বন্ধ কঠিনতর হবে। সামাজিক অগ্রগতি বজায় রাখতে হলে সহিংসতা বন্ধ করতেই হবে। আর এ জন্য চাই সমতাভিত্তিক সমাজ। তার জন্য দরকার যথাযথ আইন এবং এর প্রয়োগ। তার মধ্যে প্রধান এবং সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে 'বিচারহীনতার সংস্কৃতি' যা সহিংসতাকে আরো ভয়াবহ রূপ দিচ্ছে। আইন দিয়ে শুধুমাত্র নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব নয়, এজন্য নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা রোধে দেশের অগ্রগতিতে নারীর অবদানকে দৃশ্যমান করতে হবে, পারিবারিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি মানবিক করতে হবে এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে আন্দোলনে তরুণদের সম্পৃক্ততা জোরদার করতে হবে ।

গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের প্রকৃতি, অবস্থা ও সমস্যাবলী সম্পর্কে সঠিক চিত্রগুলো তুলে ধরা। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলীর আলোকে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে:

- নারী নির্যাতনের ধরণ, স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানা।
- নারীদের উপর নির্যাতনের কারণ অনুসন্ধান করা।
- নারী নির্যাতনের প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।
- নারী নির্যাতন দূর করার উপায় সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

গবেষণার যৌক্তিকতা

নারী প্রতি সহিংসতা বিষয়ে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত ঘটনাগুলোর ওপর ভিত্তি করে নির্যাতনের ধরন চিহ্নিতকরণ ও তা রোধে সমাজের ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার লক্ষ্যে সমীক্ষাটি করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করলে তা বাংলাদেশের নারীর প্রতি সহিংসতার প্রকৃত সম্পর্ককে আলোকপাত করতে সক্ষম হবে। আর এ

পরিস্থিতি গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরলে এর ফলে একদিকে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে যেমন সুবিধা হবে তেমনি গবেষণালব্ধ ফলাফল সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতাবোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। অন্যদিকে উক্ত ফলাফলের প্রতি আইনবিদ, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নকারী, সমাজকর্মী, এনজিও কর্মী, মানবাধিকার কর্মীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে এবং তাদের পক্ষে বাস্তবতার প্রেক্ষিতে উন্নয়নমূলক নীতিমালা প্রণয়ন সম্ভব হবে। পরবর্তীতে নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে গবেষণা করার ক্ষেত্রেও এ সমীক্ষাটি ফলপ্রসু ভূমিকা রাখবে ।

সীমাবদ্ধতা

নারীর নির্যাতন সম্পর্কে পর্যাপ্ত ও সঠিক তথ্য পাওয়া আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে সহজ নয়। কেননা সমাজের মানুষ এখনও এ ব্যাপারে সচেতন নয়, ফলে অনেক ক্ষেত্রে এটি একটি স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যার কারণে সমাজে ঘটে যাওয়া নির্যাতনের ঘটনা সাধারনত প্রকাশিত হয় না, প্রকাশিত হলেও পারিবরিক কিংবা সামাজিকভাবে প্রভাবশালী মহলের মধ্যস্থতায় আপস করে নেয়া হয়। বর্তমান সমীক্ষার সীমাবদ্ধতাসমূহ হল:

- এই সমীক্ষাটি যেহেতু একটি ক্ষেত্র অর্থাৎ শুধুমাত্র পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে সেহেতু তথ্যের অপ্রতুলতা রয়েছে। সমাজে ঘটে যাওয়া সকল ধর্ষণের তথ্য নেই। অন্যদিকে, ঘটনার সংখ্যা পাওয়া গেলেও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য- যেমন, নির্যাতনের শিকার নারীর বয়স, পেশা, অর্থনৈতিক অবস্থা, অভিযুক্ত সম্পর্কে তথ্য সকল ক্ষেত্রে পাওয়া যায়নি।
- এছাড়াও বেশিরভাগ ঘটনার ফলোআপ পরবর্তীতে পত্রিকায় প্রকাশিত না হওয়ায় আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ ও এর ফলাফল বা ঘটনার পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা যায় না।

গবেষণা পদ্ধতি

কার্যকরী সংজ্ঞা

কন্যা : ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েদের এখানে কন্যা বলা হয়েছে।

প্রাপ্ত বয়স্ক: ১৮ বছরের উর্ধ্বে সকল নারীদেরকে প্রাপ্তবয়স্ক বিবেচনা করা হয়েছে।

ধর্ষণ

যদি কোন পুরুষ বিবাহবন্ধন ব্যতীত চৌদ্দ বৎসরের অধিক বয়সের কোন নারীর সহিত তার সম্মতি ছাড়া বা ভয়ভীতি দেখিয়ে বা প্রতারণামূলকভাবে তার সম্মতি আদায় করে বা চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সের কোন নারীর সাথে সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সঙ্গম করে, তাহলে উক্ত নারীকে ধর্ষণ করেছে বলে গণ্য করা হয়।

গণধর্ষণ

যখন একাধিক পুরুষ বল প্রয়োগের মাধ্যমে জোরপূর্বক নারীর অসম্মতিতে কোন নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে তা গণধর্ষণ হিসেবে গণ্য করা হবে।

ধর্ষণের চেষ্টা

যখন এক বা একাধিক পুরুষ বল প্রয়োগের মাধ্যমে জোরপূর্বক নারীর অসম্মতিতে কোন নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টাকে ধর্ষণের চেষ্টা হিসেবে গণ্য করা হয়।

তথ্য সংগ্রহ

গৌণ উৎস (Secondary Source) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। দেশের ১৪টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত নারী নির্যাতন বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পত্রিকাসমূহ হচ্ছে- The Independent, The Daily Star, New Age, The Daily Observer, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক মানবজমিন, দৈনিক সমকাল, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক কালের কণ্ঠ।

গবেষণার ধরন গুণগত (Qualitative)।

তথ্য সংগ্রহের সময়সীমা

দেশের ১৪টি জাতীয় দৈনিকে ২০১৯ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর প্রকাশিত নারী নির্যাতন বিষয়ক ঘটনার সময়কালকে তথ্য সংগ্রহের সময়কাল ধরা হয়েছে।

গবেষণা সমগ্রক

বাংলাদেশে অবস্থানরত ১-১৮ এবং ১৮ বছর বয়সের উর্ধ্বে সকল নারী ও কন্যা গবেষণার সমগ্রক হিসেবে বিবেচিত হবেন।

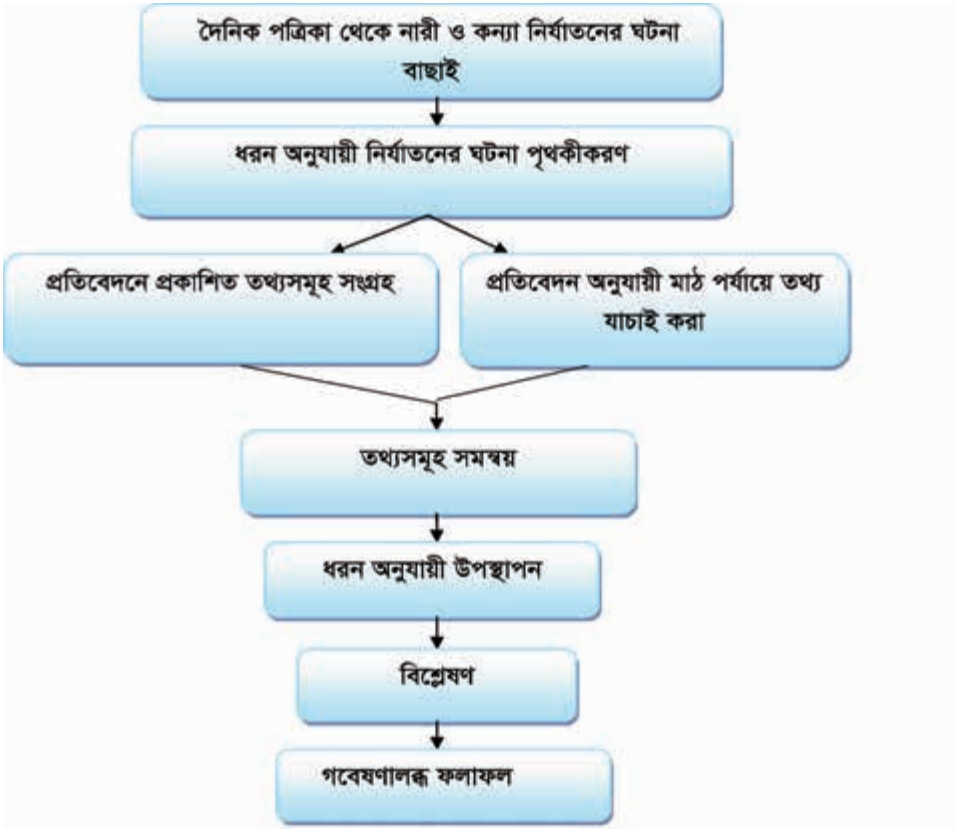

চিত্র : তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

বিশ্লেষণ পদ্ধতি

নারী ও কন্যা নির্যাতন চিত্র-২০১৮ বিষয়ক গবেষণার জন্য ১৪টি পত্রিকা হতে যৌতুক, ধর্ষণ. গণধর্ষণ ও ধর্ষণের চেষ্টা বিষয়ে সংগৃহীত উপাত্তকে গবেষণার নিম্নোক্ত ধাপে সাজানো হয়েছে। প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহকে প্রাথমিকভাবে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়- নারী ও কন্যা। বয়স, শ্রেণী এবং পেশা- এই তিনটি ক্ষেত্রে নারী ও কন্যাদের তথ্য পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমস্যা সম্পর্কে ধারণা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপসংহার গৃহীত হয়েছে। পরিশেষে গবেষণার আলোকে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিশ্লেষণের ক্ষেত্রসমূহ

নির্যাতনের ধরন

নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যার ব্যক্তিগত তথ্য

- বয়স
- পেশা
- শিক্ষাগত যোগ্যতা
- অর্থনৈতিক অবস্থা
- নির্যাতনের প্রভাব

অভিযুক্তের ক্ষেত্র-

- নির্যাতনের শিকার নারীর সাথে সম্পর্ক
- বয়স
- পেশা
- পূর্ব অভিযোগ
- অভিযুক্তের আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা

নির্যাতনের ক্ষেত্র

- স্থান
- কারণ
- আইনগত পদক্ষেপ
- সালিশি পদক্ষেপ
- স্থানীয় ও সামাজিক ভূমিকা

তথ্য যাচাইকরণ প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের বহুমুখী কার্যক্রমের মধ্যে নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধ ও নির্মূল একটি অন্যতম কার্যক্রম। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে, এর মধ্যে আছে।

- নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে সামাজিক ও আইনগত সাহায্য প্রদান করা।
- আন্দোলনমুখী কাজ (নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যার পক্ষে ন্যায় বিচারের জন্য কর্মসূচি পালন করে)।
- অ্যাডভোকেসি ও লবি করে সামাজিক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা।

- আইন সংস্কার ও আইন প্রণয়নে আন্দোলন করা।
- সহিংসতার শিকার নারীকে সাময়িক আশ্রয় প্রদান পুনর্বাসনের লক্ষ্যে 'রোকেয়া সদন' পরিচালনা।

এই সকল কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে নারী নির্যাতনের যে ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সেই বিষয়ে কার্যকরী ভূমিকা রাখার প্রয়াসে সত্যতা জানার জন্য বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তৃণমূলের বিভাগ-জেলা-থানা-ইউনিয়ন পর্যায়ের শাখাগুলোর সহায়তায় খবরের সত্যতা যাচাই করা হয়। প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী স্থানীয় আইন প্রণয়নকারী সংস্থা, ডিসি, এসপি ও সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাদের স্মারকলিপি প্রদান, অ্যাডভোকেসি লবিসহ বহুমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কাজ করে। প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হয়। এইভাবে বিভিন্ন মাত্রায় ঘটনার সত্যতা অনুসন্ধান করা হয়। যার প্রেক্ষিতে ২০১৭ সালে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সকল ঘটনার সত্যতা যাচাই করে সেগুলোকে সমীক্ষার জন্য নমুনা (sample) হিসেবে নির্বাচন করে কাজ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন কাঠামো

প্রতিবেদনের প্রথম অধ্যায়ের ১ম অংশে গবেষণার বিষয় ও এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য উপস্থাপন নিয়ে আলোচন করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন নির্যাতনের ধরনের বিশ্লেষণ ও ফলাফল উপস্থাপনা করা হয়েছে, সর্বশেষে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে গবেষণার আলোকে সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তথ্য উপস্থাপন

ধর্ষণ

গণধর্ষণ

ধর্ষণের চেষ্টা

ধর্ষণ

২০১৯ সালে পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে মোট ১৩৯১টি। তার মধ্যে ৯৭৯টি ধর্ষণের ঘটনার শিকার হয়েছে কন্যা এবং ৪১২টি ধর্ষণের ঘটনার শিকার হয়েছে নারী।

বয়স

সংবাদপত্রের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ধর্ষণের ঘটনা মোট ১৩৯১টি। এর মধ্যে ৪১২ টি ঘটনায় ধর্ষণের শিকার হয় প্রাপ্ত বয়স্ক নারী যার মধ্যে বয়স বিষয়ক তথ্য পাওয়া গেছে ১৭১টি এবং ৯৭৯টি ঘটনায় ধর্ষণের শিকার হয় কন্যাশিশুর যার মধ্যে বয়স সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া গেছে ৪০৬টি। নির্যাতনের শিকার নারীর বয়সের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বয়স কোন বিষয় না। কেননা লক্ষ করা যায়, সব বয়সের নারীই এই নির্যাতনের শিকার।

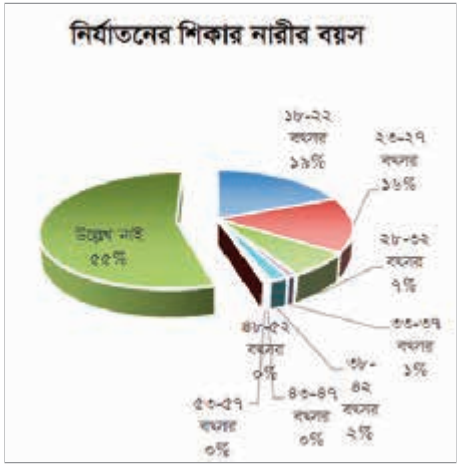

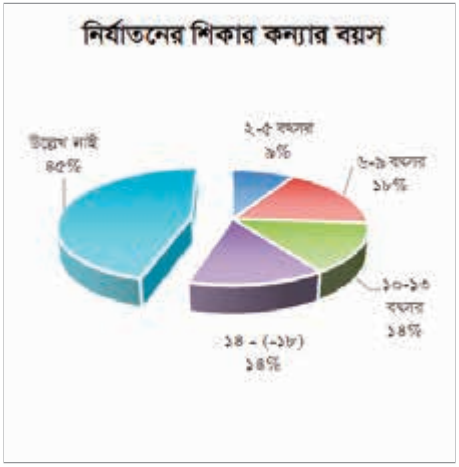

বিশ্লেষণে দেখা যায় ৫ বছর কিংবা তার কম বয়সের শিশু কন্যাও যেমন ধর্ষণের শিকার হয়েছে তেমনি ৫৭ বছরের নারীরও নিস্তার নেই এই সহিংসতার হাত থেকে। নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অধঃস্তন দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ এখানে ফুটে উঠেছে। প্রাপ্তবয়স্ক নারীর ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, অর্ধেকের বেশি (৫৫%) ঘটনায় নির্যাতনের শিকার নারীর বয়সের উল্লেখ নেই। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৯% নারীর বয়স ১৮-২২ বৎসর, ১৬% নারীর বয়স ২৩-২৭ বৎসর, ৭% নারীর বয়স ২৮-৩২ বৎসর, ১% নারীর বয়স ৩৩-৩৭ বৎসর এবং ২% নারীর বয়স ৩৮-৪২ বৎসর।

কন্যাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ৯% কন্যাদের বয়স ২-৫ বৎসর, ১৮% কন্যাদের বয়স ৬-৯ বৎসর, ১৪% কন্যাদের বয়স ১০-১৩ বৎসর, ১৪% কন্যাশিশুর বয়স ১৪-১৮ বৎসর, এবং ৪৫% কন্যাদের বয়স উল্লেখ নেই।

সামগ্রিক হিসাবে দেখা যায়, ধর্ষণের মত জঘন্য ও ঘৃণ্যতম অপরাধের শিকার হতে হচ্ছে ২-৫ বছর বয়সী শিশুদের যারা ঠিকমত কথা বলাও শিখে উঠতে পারেনি। যৌনতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা হওয়ার পূর্বেই কেবল নারী হওয়ার কারণে একজন শিশুকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়। বলা যায়, নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসাবে দেখার সমাজে প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলন ঘটেছে ধর্ষণের শিকার নারীর বয়সের ক্ষেত্রে।

শিক্ষা

১৩৯১ টি ধর্ষণের ঘটনার মধ্যে ৫৭৬টি ধর্ষণের ঘটনার ক্ষেত্রে ধর্ষণের শিকার নারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ক তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার নারীর ক্ষেত্রে শিক্ষা বিষয়ক তথ্য খুবই কম। প্রাপ্তবয়স্ক নারীর ক্ষেত্রে কলেজের ছাত্রী নারীর সংখ্যা ৮% এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ১%। কন্যার ক্ষেত্রে দেখা যায় ২০% হচ্ছে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর মধ্যে পাঠরত, ১৫% হচ্ছে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠরত।

সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে লক্ষ্য করা যায় ধর্ষণের শিকার নারীর বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে। ২-১৩ বছরের কন্যা সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের শিকার এবং এরই বড় একটা অংশ ১০-১৩ বৎসর বয়সে নির্যাতনের শিকার হয় বেশি। এ বয়সে সাধারণ একজন কন্যা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। অপরদিকে একই চিত্র লক্ষ করা যায় শিক্ষার ক্ষেত্রেও। ১ম-১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ষণে শিকার কন্যার হার বেশি এবং যার মধ্যে ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণীতে পড়ুয়া কন্যাদের সংখ্যা বেশি। শিশু পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। জীবনের উচ্ছ্বাস ও আনন্দ বোঝার আগেই এই সব কন্যারা অসুস্থ ও জটিল জীবনের সম্মুখীন হচ্ছে। কেউ হয়তো সমস্যা কাটিয়ে উঠছে আবার কেউ মানসিকভাবে সেই জটিল ও বিপর্যস্ত জীবন বয়ে চলছে।

ধর্ষণের ঘটনায় শিশুর মনে দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে তারা স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না। তারা চারপাশের মানুষগুলোকে সে অপরাধী ভাবে এবং নিজেও অপরাধ কর্মে জড়ানোর আশংকা থেকে যায়।

পেশা

সমীক্ষায় বিশ্লেষিত ১৩৯১টি ধর্ষণের ঘটনার মধ্যে বেশির ভাগ ঘটনায় ধর্ষণের শিকার নারী ও কন্যাদের পেশা বিষয়ক তথ্য পাওয়া গেছে। বিশ্লেষণে দেখা যায়, আমাদের সমাজে সামগ্রিকভাবে নারীর অবস্থান একই বলা চলে। নারীর মর্যাদার ক্ষেত্রে পেশাগতভাবে তেমন মৌলিক পার্থক্য নেই। যার কারণ হল নারীর প্রতি পুরুষের অধঃস্তন দৃষ্টিভঙ্গি।

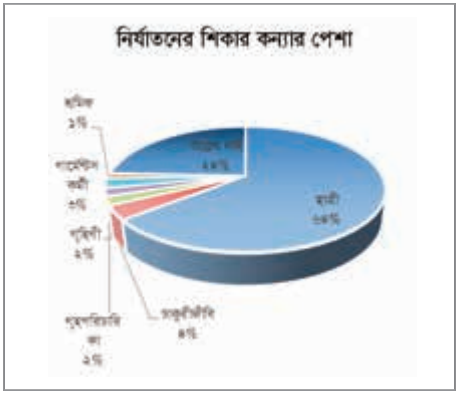

গত এক বছরের ধর্ষণের চিত্র বিশ্লেষণকালে পেশা বিষয়ক যতটা তথ্য পাওয়া গেছে তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সকল পেশার নারীই ধর্ষণের শিকার হয়েছে। জরিপের তথ্য অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক ৪১২ জন নারীর মধ্যে গৃহিণী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন সর্বাধিক- ৩২% এবং ছাত্রী ২৬%। অন্যান্য পেশার ক্ষেত্রে দেখা যায় গার্মেন্টস কর্মী ৮%, গৃহপরিচারিকা ৩%, শ্রমিক ৪%, স্বামীপরিত্যক্তা বা বিধাব ৭%, চাকুরিজীবী ২%, এবং সংস্কৃতিকর্মী/ রাজনৈতিক দলের নেতা ১% ইত্যাদি। কাজের সূত্রে ঘরের বাইরে বের হলেই কর্মজীবী নারীরাই সহিংসতার শিকার হবে বেশি তা নয়। বরং সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, পরিবার বা ঘরের মত সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থলে নারীরা সবচেয়ে বেশি অনিরাপদ ও সহিংসতার শিকার। নারী কোথাও নিরাপদ নয়- না ঘরে, না বাইরে।

পাশাপাশি দেখা যায় যে, গত এক বছরে কন্যা ধর্ষণের শিকার হয়েছে মোট ৯৭৯ জন। তার মধ্যে ছাত্রী ৬৪%, চাকরিজীবী ৪%, গার্মেন্টস কর্মী ৩%, শ্রমিক ১% এবং গৃহপরিচারিকা ২%। অর্থাৎ ছাত্রীরা ধর্ষণের শিকার হয়েছে সর্বাধিক, যা আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাতায়াতকালে বখাটেদের উৎপাত, মিথ্যা প্রলোভন বা ভয় দেখিয়ে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা প্রাইভেট পড়তে গিয়ে শিক্ষকদের দ্বারা যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের শিকার হচ্ছে কন্যারা।

পাশাপাশি মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক অবক্ষয়ে ধর্ষণের ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। সর্বোপরি বলা যায়, ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধির পেছনে রয়েছে চরম নৈতিক অবক্ষয়, ইন্টানেটের অপব্যবহার, মাদকের বিস্তার, বিচারহীনতা, বিচার প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা ও বিচারের দীর্ঘসূত্রতা। সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের পেছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে যা ভিন্ন বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

ঘটনার এলাকা

ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে মেট্রোপলিটন শহর, জেলা শহর, উপজেলা, গ্রাম সকলক্ষেত্রে। আগেই বলা হয়েছে ধর্ষণের কিছু ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সকল ঘটনা প্রকাশিত হয় না।

জরিপে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ধর্ষণের অর্ধেক ঘটনাই সংগঠিত হয়েছে উপজেলা পর্যায়ে (৫০%)। গ্রাম এলাকায় ২৬%, জেলা শহরে ১৮%, এবং মেট্রোপলিটন এলাকায় ৬%।

অভিযুক্ত সম্পর্কে তথ্য

কার দ্বারা নির্যাতনের শিকার :

সমীক্ষায় ১৩৯১টি ধর্ষণের ঘটনার মধ্যে বেশিরভাগ ঘটনার ক্ষেত্রে নারী ও কন্যা কার দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়েছিল সে সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া গেছে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, নারী ধর্ষণের শিকার হয় সমাজের নানা ক্ষেত্র থেকে। ধর্ষণের বর্বর ঘটনা ঘটায় অভিভাবক থেকে শুরু করে আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, বন্ধুবান্ধব।

এতে দেখা যায় প্রায় অর্ধেক নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে প্রতিবেশী, চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও বখাটে দ্বারা। মোট অভিযুক্তের মধ্যে প্রতিবেশী দ্বারা ৪৫%, প্রেমিক দ্বারা ১৪%, চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও বখাটে দ্বারা ৬%, নিজ আত্মীয় স্বজন দ্বারা ৯%, স্থানীয় প্রভাবশালী মহল দ্বারা ৫%, স্কুল ও প্রাইভেট শিক্ষক দ্বারা ৩%, অপরিচিত ব্যক্তি ৫%, চিকিৎসক দ্বারা ১%, স্বামী ও তার পরিবারের আত্মীয় স্বজন দ্বারা ২%, গৃহকর্তা দ্বারা ১%, সহপাঠী/ সহকর্মী দ্বারা ১%, বাড়িওয়ালা/বাড়ির মালিক ১% এবং অন্যান্য দ্বারা ৫% নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। অধিকাংশ নারী ও কন্যা ধর্ষণের শিকার হয়েছে

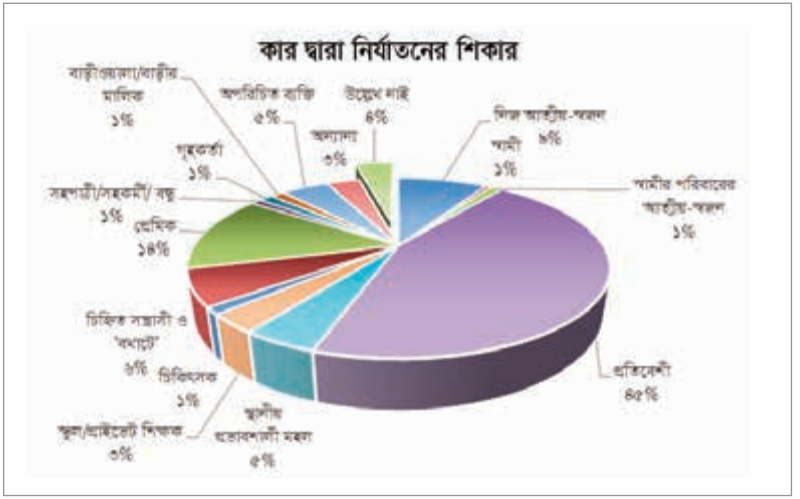

প্রতিবেশী, প্রেমিক ও চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও বখাটে দ্বারা। নারী যেমন কোন বয়সেই নিরাপদ নয় ঠিক তেমনি কারো কাছেও নিরাপদ নয়।

বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নারী বা কন্যা ধর্ষণের শিকার হয় পরিচিত মানুষজন দ্বারা। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই প্রেমের প্রস্তাব বা বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হওয়া বা কোন কুপ্রস্তাবে সাড়া না দেয়ার কারণে, বিয়ে/ চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে, স্কুলে আসা ও যাওয়ার পথে, ভয় দেখিয়ে, জোরপূর্বকভাবে নারী বা কন্যারা ধর্ষণের শিকার হয়েছে। বিশেষ করে কন্যাদের ক্ষেত্রে বাসায় একা পেয়ে বা চকলেট, কার্টুন, খেলার, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি বিভিন্নভাবে প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ করছে।

অভিযুক্তের বয়স

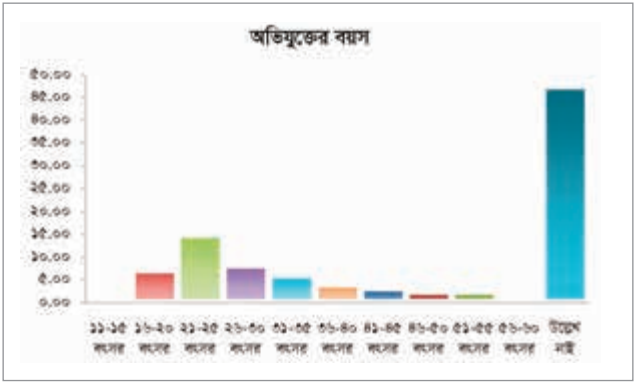

অভিযুক্তের বয়সের ক্ষেত্রে ধর্ষণে প্রায় অর্ধেক ঘটনার ৪৮% অভিযুক্তের বয়স উল্লেখ নেই। তবে যে ৫৫% বয়সের উল্লেখ রয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ১১ থেকে ৬০ বছর বয়সের পুরুষ ধর্ষণের মত বর্বর ও ভয়াবহ কর্মকাণ্ডে যুক্ত রয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১১-১৫ বছর বয়সী অভিযুক্ত রয়েছে ২%, ১৬-২০ বছর বয়সী অভিযুক্ত রয়েছে ৭%, ২১-২৫ বছর বয়সী অভিযুক্ত রয়েছে ১৫%, ২৬-৩০ বছর বয়সী অভিযুক্ত রয়েছে ৮%, ৩১-৩৫ বছর বয়সী অভিযুক্ত রয়েছে ৬% এবং ৩৬-৪০ বছর বয়সী অভিযুক্ত রয়েছে ৪%, ৪১-৪৫ বছর বয়সী অভিযুক্ত রয়েছে ৩%, ৪৬-৫০ বছর বয়সী অভিযুক্ত রয়েছে ৩%, ৫১-৫৫ বছর বয়সী অভিযুক্ত রয়েছে ৩% এবং ৫৬-৬০ বছর বয়সী অভিযুক্ত রয়েছে ১%।

প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, ধর্ষণের মত নির্যাতনে তরুণ সমাজের সম্পৃক্ততা বেশি। ১১-৩০ বছর বয়সের মধ্যে মোট

৩২% অভিযুক্ত, বিশেষ করে ২১-২৫ বছর বয়সে সবচেয়ে বেশি। তথ্য প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহার, সহজলভ্য ইন্টারনেট, স্মার্ট ফোন ও সর্বোপরি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এসব কিছুতে সবচেয়ে বেশি বিচরণ করে তরুণ সমাজ। তাই ঝুকিটাও বেশি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এখন সবচেয়ে বড় অসামাজিক মাধ্যমে রূপ নিয়েছে। যার ফলে তরুণসমাজের নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটচ্ছে এবং তারা ধর্ষণের মত জঘন্য অপরাধসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। যে তারুণ্য পরিবার, দেশ ও সমাজকে প্রযুক্তির ছোঁয়ায় উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়ার কথা, আজ তাদের একটা বড় অংশ ধর্ষণের মত নির্যাতনে সম্পৃক্ত হচ্ছে। এ ধরনের ভয়াবহ চিত্র উদ্বেগজনক।

অভিযুক্তের পেশা

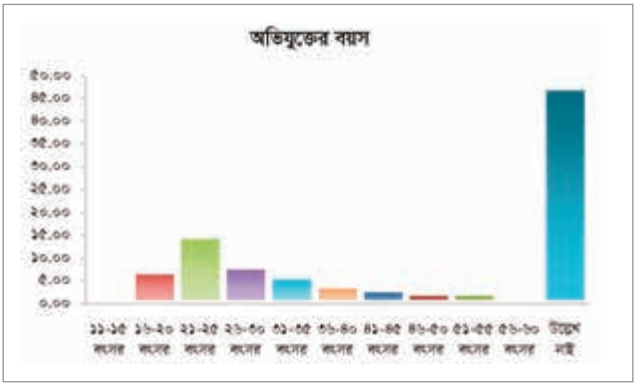

অভিযুক্তদের পেশাগত বিশ্লেষণে দেখা যায়, ধর্ষকের পেশা বিষয়ক তথ্য সংবাদপত্রের পাতায় খুব একটা পাওয়া যায়নি। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের শিকার হয়েছে চালক যা খুবই উদ্বেগজনক এবং ভয়ংকর। যা বিগত বছরের চেয়ে বেশি। তাছাড়াও বখাটে ও সন্ত্রাসী দ্বারা ধর্ষণের শিকার ৫%, শিক্ষক দ্বারা ধর্ষণের শিকার ৪%, ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ী (মুদির দোকানদার, ফেরিওয়ালা, চা বিক্রেতা) দ্বারা ধর্ষণের শিকার ৬%, শ্রমিক দ্বারা ধর্ষণের শিকার ৩%, রাজনীতির সাথে জড়িত দ্বারা ধর্ষণের শিকার ৩%, ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী দ্বারা ধর্ষণের শিকার ১%, চিকিৎসক দ্বারা ধর্ষণের শিকার ১%, চাকুরিজীবী দ্বারা ধর্ষণের শিকার ৩%, পুলিশ/সেনা/বিজিবি দ্বারা ধর্ষণের শিকার ১% এবং অন্যান্য পেশার অভিযুক্ত রয়েছে ৯%।

যদিও পেশা সংক্রান্ত তথ্য খুব একটা বেশি পাওয়া যায়নি তারপরও যা পাওয়া গেছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সকল ধরনের পেশার লোক এই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। আইনশৃংখলা বাহিনী থেকে শুরু করে ছাত্র, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, ডাক্তার, শ্রমিক ইত্যাদি। নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে পেশা বা শিক্ষা তেমন প্রভাব ফেলে বলে তথ্য প্রমাণ করে না।

২০১৯ সালে সবচেয়ে বেশি অভিযুক্তের পেশায় রয়েছে চালক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (মুদি দোকানদার, স্টেশনারি বিক্রেতা ইত্যাদি), শিক্ষক ও এলাকার বখাটে। অপরদিকে সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের শিকার হয়েছে কন্যা যারা মূলত ছাত্রী। অর্থাৎ বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে বখাটে বা পরিবহন চালক, এমনকি বিদ্যালয়ে যিনি শিক্ষা দিবেন প্রত্যেকটি ক্ষেত্র কন্যার জন্য সবচেয়ে বেশি অনিরাপদ ও ভয়ংকর ঝুকিপূর্ণ। যা খুবই উদ্বেগজনক, কেননা এটি নারীর ক্ষমতায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে।

ধর্ষণের শিকার নারীর উপর নির্যাতনের প্রভাব

যেকোন নির্যাতনের শিকার নারীদের উপর নির্যাতনের প্রভাব বিভিন্নভাবে পড়ে। প্রভাব নানা ধরনের হয় যেমন শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক। শারীরিক এর মধ্যে রয়েছে হত্যা, আত্মহত্যা, অন্তঃসত্ত্বা হওয়া, আহত হওয়া ইত্যাদি। মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থের মধ্যে রয়েছে ট্রমার সৃষ্টি হওয়া, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা, নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা ইত্যাদি। ধর্ষণের শিকার নারী ও কন্যাদের স্কুল, কলেজে বা কর্মক্ষেত্রে যাওয়া বন্ধ, হাসপাতালে ভর্তি ইত্যাদি কারনে অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আবার সামাজিকভাবে নানা সমস্যা যেমন, লোকলজ্জার ভয়ে বাইরে যাওয়া বা পড়াশোনা বন্ধ, কুৎসা রটনা, বিয়ের সমস্যা ইত্যাদি সামাজিক প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত।

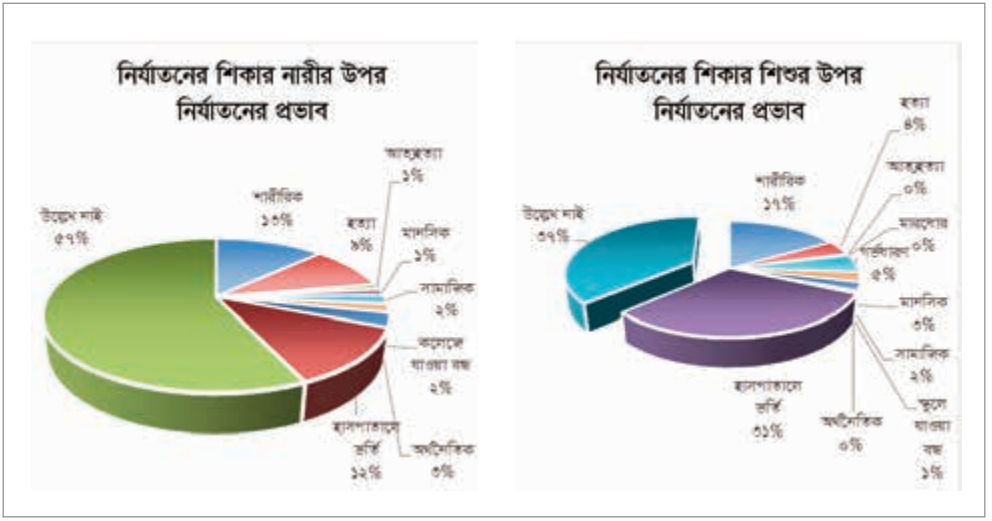

সমীক্ষায় দেখা যায় প্রাপ্তবয়স্ক নারীর ক্ষেত্রে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ১৩%। এদের মধ্যে হত্যা করা হয়েছে ৯% নারীকে, স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছে ২%, অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ৩% এবং মানসিকভাবে অসুস্থ ১% নারী। ১২% নারীকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে।

কন্যাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ১৭%। গুরুতর ভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৩১%। হত্যা করা হয়েছে ৪% কন্যাকে। অন্তঃসত্ত্বা হয় ৫% কন্যা। তাছাড়াও দেখা যায়, সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়ে, লোকলজ্জার ভয়ে ১% কন্যা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছে, যা তাদের সুন্দর ভবিষ্যতের বাধাস্বরূপ।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ধর্ষণের শিকার নারীর উপরে সকল ধরনের প্রভাব একই সঙ্গে পড়ে। একটি বিশেষ ক্ষেত্রেই ধর্ষণের প্রতিক্রিয়া রয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। সামগ্রিকভাবে সেই নারীর সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

আইনগত পদক্ষেপ

২০১৯ সালের ধর্ষণের ঘটনার বিশ্লেষণে একটি ইতিবাচক দিক লক্ষ্য করা হয়। তা হচ্ছে বেশির ভাগ ঘটনায় অর্থাৎ ৪৬% ক্ষেত্রে ধর্ষণের মামলা হয়েছে। ৯% ক্ষেত্রে মামলা হয়নি। যেসব ক্ষেত্রে মামলা হয়নি উল্লেখ রয়েছে তার কারনে দেখা যায় ২% ক্ষেত্রে হুমকীর কারণে মামলা করেনি। যেখানে ৫৬% ঘটনায় মামলা হয়েছে উল্লেখ রয়েছে সেখানে দেখা গেছে ২১% অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে, গ্রেফতারে চেষ্টা চলছে ৮% এবং ৪% ঘটনায় ইচ্ছে করে গ্রেফতার করছে না।

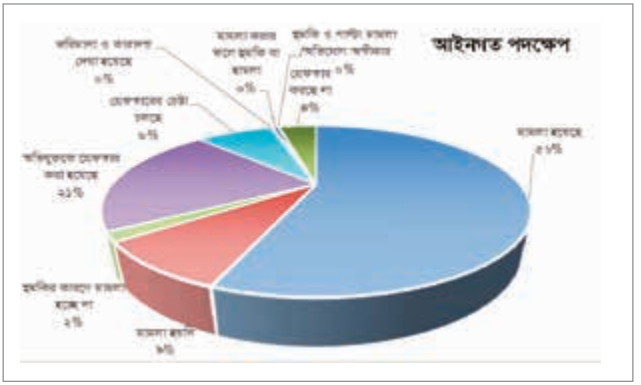

ধর্ষণের ঘটনায় মামলা হলেও ধাপে ধাপে প্রতিকূলতার জালে জড়িয়ে পড়ছে বিচার প্রাপ্তির আশা। ভয়-ভীতি অথবা অর্থের বিনিময়ে বাদী পক্ষের সঙ্গে মীমাংসা করে মামলা দুর্বল করে ফেলা হয়। সাক্ষী উধাও হওয়ার ঘটনা নিত্য-নৈমিত্তিক। এসব কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ধর্ষণের মামলা। আইন প্রয়োগ যেমন ঠিকমত হচ্ছে না তেমনি সামাজিকভাবেও ধর্ষকদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রতিরোধ গড়ে উঠছে না।

অনেক সময় মামলা করতেও ভোগান্তি হয় যেমন মামলা নিতে চায় না, মামলার ঘটনা ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে । আর মামলা হলেও অনেক ক্ষেত্রে ন্যায্য বিচার পাওয়া যায় না। কারণ শেষ পর্যন্ত নানা উপায়ে ভিকটিমকে বিরত রাখা হয়। সাক্ষীদের সাক্ষ্য দিতে দেয়া হয় না। মামলা ঝুলে থাকার কারণে অভিযোগ প্রমাণ করাও কঠিন হয়ে পড়ে।

অভিযুক্তের অভিভাবক/আত্মীয়ের ভূমিকা

যে কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীর আত্মীয় স্বজন বা অভিভাবকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অভিযুক্ত কে তারা প্রশ্রয় দিলে অভিযুক্ত পুনরায় অপরাধ করার সাহস পায়। কিন্তু শাসন করলে বা প্রশ্রয় না দিলে অভিযুক্ত আর সাহস পায় না। সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ১% আত্মীয় স্বজন বা অভিভাবক অভিযুক্তকে শাসন করে অথবা অভিযোগ শিকার করে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। ৮% আত্মীয় স্বজন বা অভিভাবক অভিযুক্তের অভিযোগ শিকার না করে ধর্ষণের শিকার নারী ও তার পরিবারকে হুমকি দিয়েছে, টাকার বিনিময়ে মিমাংসা করছে অথবা প্রভাবশালী হওয়ায় সালিশ না মেনে নেতিবাচক ভূমিকা রাখছে। উল্লেখ্য যে, ৯১% ঘটনায় আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা উল্লেখ নেই।

সালিশ/ সামাজিকভাবে মীমাংসা

আমরা জানি ধর্ষণের ঘটনায় কোনো সালিশ বা মীমাংসা হতে পারে না। এটি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তারপরও আমাদের সমাজে ধর্ষণের ঘটনায় সালিশ ব্যবস্থা গ্রহণ বা সামাজিকভাবে মীমাংসা করতে দেখা যায়। সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১৯ সালে এ ধরনের সালিশে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ১% ক্ষেত্রে, নির্যাতনের শিকার নারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ১%, ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে ৮% ক্ষেত্রে। এ বিষয়ে বেশির ভাগ ঘটনার (৯১%) তথ্য উল্লেখ ছিল না।

ধর্ষণের বিরুদ্ধে সামাজিক উদ্যোগ

একদিকে ৫ বৎসর থেকে ৮০ বছরের নারীর উপর ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, ধর্ষণ করেছে অভিভাবক, শিক্ষক, আত্মীয় স্বজন, প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ আবার এই ধর্ষণ প্রতিরোধে সমাজের বিবেকবান ও মানবাধিকারে বিশ্বাসী জনগণ ও ব্যক্তিবর্গ পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। অন্যদিকে আবার সমাজের আর একটি শ্রেণী এই পদক্ষেপের নানা বিরুদ্ধাচারণ করছে।

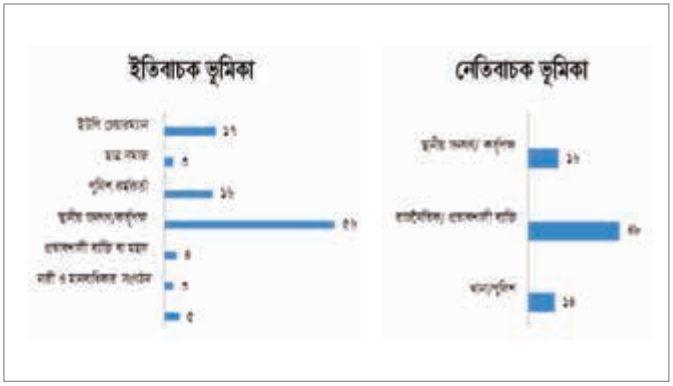

স্থানীয় উদ্যোগ ও প্রতিক্রিয়া

ধর্ষণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয়ভাবে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের উদ্যোগ ও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

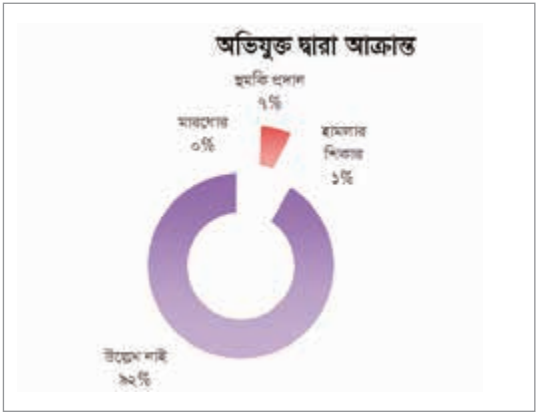

ধর্ষণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ষণের বিচারের লক্ষ্যে ১০৪টি ধর্ষণ ঘটনায় স্থানীয়ভাবে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার তথ্য পাওয়া যায়। ইতিবাচক পদক্ষেপগুলির মধ্যে রয়েছে নারী ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহের পদক্ষেপ, প্রশাসন ও স্থানীয় জনগণের উদ্যোগ ইত্যাদি। এছাড়াও স্থানীয় সরকারের উদ্যোগ রয়েছে যদিও তা তুলনামূলকভাবে কম। স্থানীয়ভাবে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ হচ্ছে এলাকায় সমাবেশ করা, বৈঠক বসানো, থানায় রিপোর্ট করা, অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ইত্যাদি। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে ধর্ষণকারীকে ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। যদিও এ ধরনের পদক্ষেপ একেবারেই ন্যূনতম সংখ্যক, তারপরও বলা যায় এ ধরনের পদক্ষেপ নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সমাজে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করবে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে, ধর্ষণের শিকার নারী, স্থানীয় জনগণ ও অভিভাবকদের মধ্যেও সচেতনতা বাড়ছে।

নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়, খুব কম সংখ্যক ধর্ষণের ঘটনার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া বিষয়ক তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে সরাসরি হুমকি ও ভয়-ভীতি প্রদান, মামলা করার ফলে মারধোর, হামলার শিকার, থানা ও পুলিশের পক্ষ থেকে অসহযোগিতা এবং স্থানীয় জনগনের পক্ষ থেকে অসহযোগিতা এবং রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের ক্ষমতার প্রভাব।

নারীর প্রতি নির্যাতনের ধরনগুলো সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহার করে ধর্ষণের দৃশ্যগুলো ভিডিও করে নারীকে ব্লাকমেইলিং করছে। যাতে নারী সামাজিকভাবে আরও বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ধর্ষক শুধু ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয় না, ধর্ষণের শিকার নারী ও তার পরিবারের উপর চালায় আরো নানা ধরনের অমানবিক নির্যাতন।

ধর্ষণের চেষ্টা

ধর্ষণের চেষ্টা বলতে আমরা বুঝি ধর্ষণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়া। কিন্তু ধর্ষণ করার চেয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করার ভয়াবহতা কোন অংশে কম নয়। বল প্রয়োগ করে ধর্ষণের চেষ্টা করা ধর্ষণেরই সমতুল্য। এটি এমন ধরনের যৌন লাঞ্ছনা যা শারীরিক সম্পর্কজনিত, যা এক বা একাধিক ব্যক্তির অপর পক্ষের সম্মতি ব্যতিরেকে জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা এবং ধর্ষণের মতই একটি বড় ধরনের অপরাধ। এই কাজে শারীরিক শক্তি, বাধ্যতা, ক্ষমতার অপব্যাবহার ইত্যাদি নিয়ামক হিসেবে কাজ করে এবং একজন নারীর জন্য তা মানবাধিকার লংঙ্ঘন। ধর্ষণের চেষ্টায়ও আমরা নির্যাতনের ভয়াবহ ধরন হিসেবে আমরা মনে করি।

ধর্ষণ চেষ্টার শিকার নারী ও কন্যার পেশা

সমীক্ষায় বিশ্লেষিত প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে ২১১টি ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনার মধ্যে ৭৭ জন নারী ও ১৩৪ জন কন্যার মোট ১৫১টি ঘটনায় (৭২%) পেশা বিষয়ক তথ্য পাওয়া গেছে। বিশ্লেষণে দেখা যায়, আমাদের সমাজে সামগ্রিকভাবে নারীর অবস্থান একই বলা চলে। নারীর মর্যাদার ক্ষেত্রে শ্রেণীগতভাবে তেমন মৌলিক পার্থক্য নেই। ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, কর্মজীবী, গৃহবধু সকলের ধর্ষণের শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে মৌলিক কোন তফাৎ নেই। শুধুমাত্র নারী হওয়ার জন্য তাকে ধর্ষণের মত জঘন্য নির্যাতনের শিকার হতে হয়।

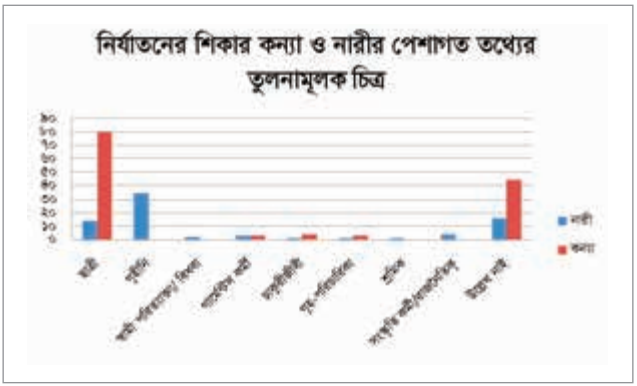

সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী **প্রাপ্তবয়স্ক** ৭৭ জন নারীর মধ্যে ৪৬% গৃহিনী ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়েছেন, যা সর্বাধিক। তাছাড়াও ১৮% ছাত্রী ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়েছেন, গার্মেন্টস কর্মী ৪%, চাকরিজীবী ১%ও গৃহপরিচারিকা ১%, স্বামী পরিত্যাক্তা/ বিধবা ৩% এবং সংস্কৃতি কর্মী ৫%।

পাশাপাশি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, গত এক বছরে অপ্রাপ্তবয়স্ক **কন্যারা** ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়েছে সবচেয়ে বেশি মাত্রায় (১৩৪টি ঘটনা), যা প্রাপ্তবয়স্ক নারীর হতে প্রায় দ্বিগুণ। ১৩৪ টি ঘটনার মধ্যে ৯০টি ঘটনায় ধর্ষণের শিকার কন্যার পেশা সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া গেছে। তার মধ্যে বেশির ভাগই ছাত্রী ৮০%। চাকরিজীবী ৩%, গৃহপরিচারিকা ২% এবং গার্মেন্টস কর্মী ২%। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যারা ধর্ষণের চেষ্টার শিকারে পরিণত হচ্ছে, তাদের অধিকাংশই কন্যা এবং ছাত্রী। কন্যারা দুর্বল হওয়ায় সহজেই শিকারে পরিণত হচ্ছে। তারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের দ্বারা যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে| সেইসঙ্গে অব্যাহতভাবে বেড়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাতায়াতকালে বখাটেদের উৎপাত এবং পর্নোগ্রাফির শিকারের ঘটনা।

নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যার বয়স

ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনায় নারী ও কন্যার বয়সের তথ্য রয়েছে ২১১টি। তার মধ্যে ধর্ষণের চেষ্টার শিকার নারীর বয়স

বিষয়ক তথ্য পাওয়া গেছে ২৯টি ঘটনার এবং ৭২টি ঘটনা কন্যাদের। বেশির ভাগ প্রাপ্তবয়স্ক নারীরই বয়স উল্লেখ নেই। প্রাপ্ত তথ্য হতে ধর্ষণের চেষ্টার শিকার নারীর ও কন্যার বয়সের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কন্যারাই ধর্ষণের সবচেয়ে বড় শিকার। কারণ তারা কিছুই বলতে পারে না, অসহায় থাকে ধর্ষণের সময়। ধর্ষককে ভয়ও পায়। কন্যারা কেবল ঘরের বাইরেই নয়, ধর্ষণের শিকার হচ্ছে নিজ ঘরে, নিকটাত্মীয়-স্বজনদের হাত থেকেও রক্ষা পাচ্ছে না তারা।

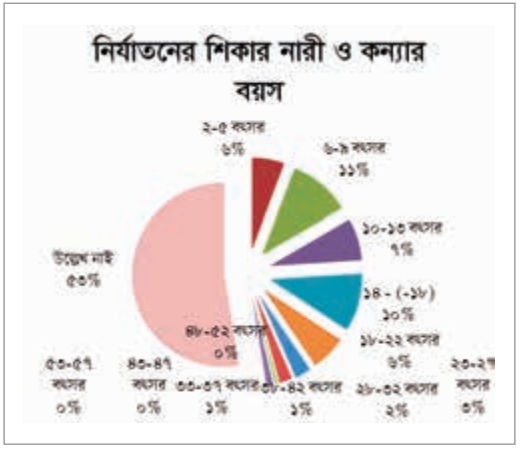

৫ বছর কিংবা তার কম বয়সের কন্যাও যেমন ধর্ষণের লালসার শিকার হয়েছে তেমনি ৪০-উর্ধ্ব বছরের নারীও এই লালসার হাত থেকে মুক্তি পায়নি। যে কোন বয়সেই নারী যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে ভোগের পন্য ছাড়া কিছুই নয় সেটাই এখানে ফুটে উঠেছে।

কন্যাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ৬% কন্যার বয়স ২-৫ বৎসর, ১১% কন্যার বয়স ৬-৯ বৎসর, ৭% কন্যার বয়স ১০-১৩ বৎসর, ১০% কন্যার বয়স ১৪-১৮ বৎসর। মোট ঘটনার ৩২% কন্যা ধর্ষণের চেষ্টার শিকার যাদের বয়স ২ বৎসর থেকে ১৮ বয়সের মধ্যে, যা একটি কন্যার মানসিক বিকাশের জন্য খুবই ক্ষতিকর এবং উদ্বেগজনক।

প্রাপ্তবয়স্ক নারীর ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ঘটনায় বয়স উল্লেখ ছিল না। মোট ৫৩% ঘটনায় বয়সের উল্লেখ ছিল না।

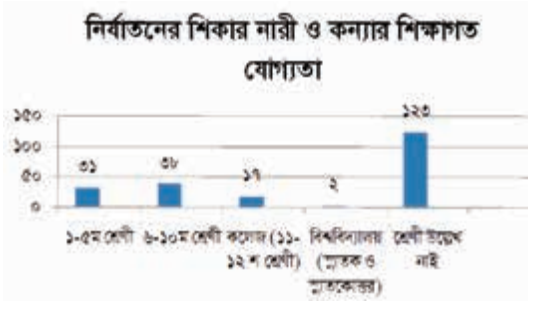

শিক্ষা

২১১টি ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনার মধ্যে ৮৮টি ক্ষেত্রে কন্যা ও নারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ক তথ্য পাওয়া গেছে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ১৫%, ১৮% ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীর মধ্যে অধ্যয়নরত, ৮% কলেজ পড়ুয়া এবং ১% বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী। ১২৩টি ঘটনায় (৫৮%) শিক্ষাগত যোগ্যতার উল্লেখ ছিল না। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে সাধারণত কর্মজীবী নারী ও গৃহিণীর শিক্ষাগত যোগ্যতার উল্লেখ থাকে না।

ঘটনার স্থান

ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে মেট্রোপলিটন শহর, জেলা শহর, উপজেলা, গ্রাম সকলক্ষেত্রে। আগেই বলা হয়েছে ধর্ষণের কিছু ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সকল ঘটনা প্রকাশিত হয় না। জরীপে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ধর্ষণের চেষ্টার অধিকাংশ ঘটনা সংগঠিত হয়েছে উপজেলা পর্যায়ে। উপজেলায় ৪৪%, গ্রাম এলাকায় ২৯%, জেলা শহরে ২১% এবং মেট্রোপলিটন এলাকায় ৬%।

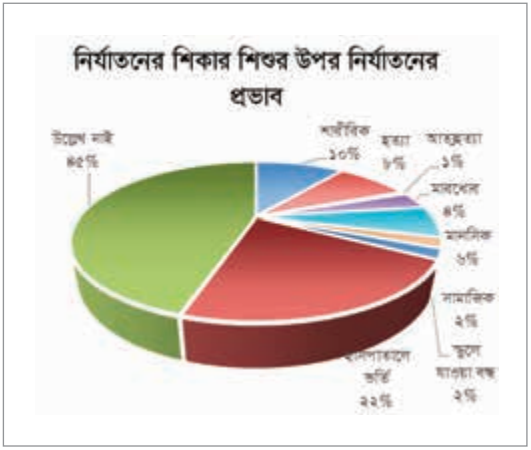

ধর্ষণের চেষ্টার শিকার কন্যা ও নারীর উপর নির্যাতনের প্রভাব

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নারী বা কন্যাকে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। সমীক্ষা অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক নারীর ক্ষেত্রে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ১২% নারী। হত্যা ১%, আত্মহত্যা ১%, মানসিকভাবে অসুস্থ ১২%, কলেজে যাওয়া বন্ধ ৭% এবং হাসপাতালে ভর্তি ৬% নারী। তাছাড়াও ধর্ষণ চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে অভিযুক্ত দ্বারা ৯% নারী মারধোর ও সামাজিকভাবে হেনস্তার শিকার হয়েছে।

কন্যার ক্ষেত্রে দেখা যায়, শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ১০%। ধর্ষণের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে হত্যা করা হয় ৮% কন্যাকে। গুরুতর আহত অবস্থায় ২২% কন্যা, যাদের হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। সামাজিকভাবে অপদস্থ হয় ২%, লোকলজ্জার ভয়ে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে ২% এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয় ৬% ও ১% কন্যা আত্মহত্যা করে। তাছাড়াও অভিযুক্ত দ্বারা মারধোরের শিকার হয় ৪% কন্যা। ধর্ষণের চেষ্টায় কন্যা ও প্রাপ্তবয়স্ক নারী উভয়ের ক্ষেত্রে শারীরিক প্রভাবের পাশাপাশি অভিযুক্ত দ্বারা মারধোর ও সামাজিকভাবে হেনস্তার শিকার হচ্ছে বেশি। যার প্রভাবে নির্যাতনের শিকার কন্যা আত্মহত্যা ও স্কুল/কলেজে যাওয়া বন্ধ করছে। অর্থাৎ নির্যাতনের শিকার কন্যা শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সকলভাবেই বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। পরবর্তীতে আরও নির্যাতনের আশংকা তাদের মানসিক অবস্থা বিপর্যস্ত করে তোলে।

অভিযুক্ত সম্পর্কে তথ্য

কার দ্বারা নির্যাতনের শিকার

সমীক্ষায় ২১১টি ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনার মধ্যে ১৯৩টি ঘটনায় নারী ও কন্যার ধর্ষক কারা ছিল সে সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া গেছে। এতে দেখা যায় প্রায় অর্ধেকের বেশি নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে প্রতিবেশী, শিক্ষক ও চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও বখাটেদের দ্বারা। মোট অভিযুক্তের মধ্যে অর্ধেকের বেশি ৫৪% নারী ও কন্যা ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয় প্রতিবেশী,

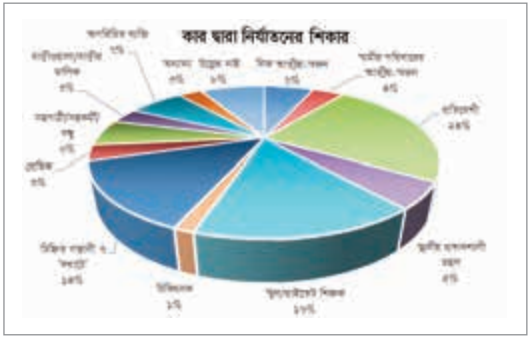

শিক্ষক ও এলাকার বখাটে/ সন্ত্রাসী দ্বারা। প্রতিবেশী দ্বারা ২৪% , চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও বখাটে দ্বারা ১৪% নারী, স্কুল ও প্রাইভেট শিক্ষক দ্বারা ১৬%, স্থানীয় প্রভাবশালী মহল দ্বারা ৫%, নিজ আত্মীয় স্বজন দ্বারা ৬% ও স্বামীর আত্মীয় স্বজন দ্বারা ৪%, সহপাঠী/বন্ধু/প্রেমিক দ্বারা ৯%, অপরিচিত ব্যাক্তি দ্বারা ৭%, চিকিৎসক দ্বারা ১% এবং বাড়ির মালিক দ্বারা ৩% নারী ধর্ষণের চেষ্টার মুখোমুখি হয়েছে। অধিকাংশ কন্যাই ধর্ষণের মতো জঘন্য পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে প্রতিবেশী, শিক্ষক, চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও বখাটেদের দ্বারা। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় শিশুর কাছের মানুষের প্রভাবে মানসিক ও শারীরিক বিকাশ ঘটে থাকে এবং তাদের ওপর নির্ভর করে। বেড়ে ওঠার বিভিন্ন পর্যায়ে তার এই নির্ভরতা কমতে থাকলেও এর প্রয়োজনীয়তা কখনই একেবারে ফুরোয় না। অনেকক্ষেত্রে বাবা-মায়ের বাইরেও অন্যদের ওপরও নির্ভর করতে হয় শিশুকে। কারও কাছ থেকে নির্যাতনের শিকার হলে, পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে সেটা শেয়ার করা শিশুদের পক্ষেও সবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। আর এই সুযোগটাই কাজে লাগান সুযোগসন্ধানীরা।

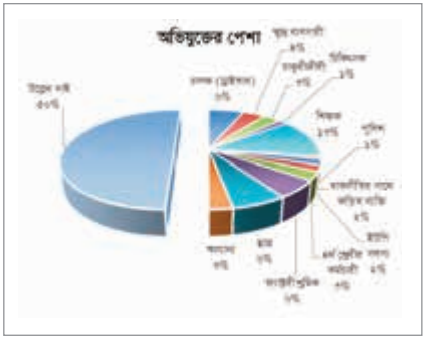

ধর্ষণ চেষ্টায় **অভিযুক্তদের পেশাগত তথ্য** বিশ্লেষণে দেখা যায়, শিক্ষক দ্বারা ধর্ষণের চেষ্টার শিকার ১৩%, ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ী (মুদির দোকানদার, ফেরিওয়ালা, চা বিক্রেতা) দ্বারা ধর্ষণের চেষ্টার শিকার ৪%, চালক দ্বারা ৬%, চিকিৎসক দ্বারা ১%, চাকুরিজীবী দ্বারা ৩%, শ্রমিক দ্বারা ৬%, ছাত্র দ্বারা ধর্ষণের চেষ্টার শিকার ৬%, ইউপি সদস্য দ্বারা ধর্ষণের চেষ্টার শিকার ২%, **রাজনীতির সাথে জড়িত** দ্বারা ধর্ষণের চেষ্টার শিকার ২%, পুলিশ দ্বারা ১%।

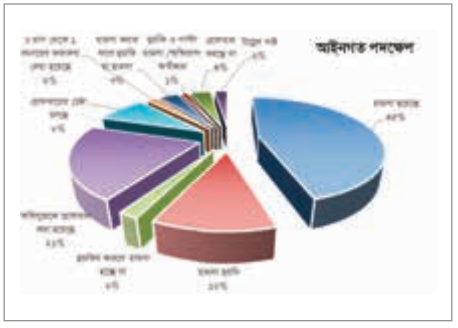

আইনগত পদক্ষেপ

২০১৯ সালে ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনায় দেখা যায় বেশির ভাগ ঘটনায় নারী ধর্ষণের চেষ্টার অপরাধে মামলা করছেন। ৪৫% ক্ষেত্রে ধর্ষণের চেষ্টার মামলা হয়েছে সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গেছে। ১২% ক্ষেত্রে মামলা হয়নি সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গেছে, হুমকির কারণে মামলা হচ্ছে না ২%, গ্রেফতার করা হয়েছে ২১%, অভিযুক্তকে ১ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে ২%, গ্রেফতারে চেষ্টা চলছে প্রায় ৮% ঘটনায়, অভিযুক্তকে গ্রেফতার করছে না ৪%, মামলা করার ফলে হামলার শিকার ৩%, হুমকি ও পাল্টা মামলা/অভিযোগ অস্বীকার ১% এবং গ্রেফতারের করছে না ৪% ঘটনায়।

ধর্ষণের বিরুদ্ধে সব শ্রেণী-পেশার মানুষের সচেতনা বেড়েছে। যার চিত্র আমরা মামলা করার সংখ্যা দেখে বুঝতে পারি। তারপরও ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন নারীরা এবং ন্যায়বিচারের প্রত্যাশায় ভুক্তভোগী হতে হচ্ছে। কিন্তু অপরাধীরা থাকছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। দ্রুত বিচার করার আইন থাকলেও শিশু ধর্ষণের মামলা বিচার পেতে বছরের পর বছর লেগে যায়। ফলে মামলার সাক্ষী হাজির করতে সমস্যার সৃষ্টি হয়। অনেক সময় মামলার আলামতও নষ্ট হয়ে যায়। ফলে মামলার রায়ে সাজা পাওয়ার হার খুবই কম। মামলার দীর্ঘসূত্রতা এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি ও তার পরিবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে মামলা করতেই চায় না। অন্যদিকে অপরাধের মাত্রাও ক্রমাগত বাড়তে থাকে।

সালিশ/ সামাজিকভাবে মীমাংসা

ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনায় সালিশ ব্যবস্থা গ্রহণ বা সামাজিকভাবে মীমাংসার ক্ষেত্রে জরিপ অনুযায়ী দেখা যায় এধরনের সালিশে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে খুব সামান্য ক্ষেত্রে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোনো ব্যবস্থার উল্লেখ নেই।

গণধর্ষণ

নারীরা নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। তারমধ্যে গণধর্ষণ হচ্ছে একটি ভয়াবহ, জঘন্যতম এবং নৃশংস নারী নির্যাতন। যার মধ্য দিয়ে সমাজে নারীর প্রতি চরম অবমাননার সহিংসতার চিত্র ফুটে উঠে। যখন একের অধিক পুরুষ বলপ্রয়োগ করে একসাথে একজন নারীর অসম্মতিতে তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে তা হচ্ছে গণধর্ষণ।

সমীক্ষাকালীন সময়ে গণধর্ষণের ১৮২টি ঘটনা ঘটেছে, এর মধ্যে ৮৮ জন শিশু এবং ৯৪ জন নারী। দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদনগুলো অনেকক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ ছিল, তাছাড়া সব রিপোর্টের ফলোআপও পত্রিকায় পাওয়া যায়নি। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জরিপে নির্যাতনের ঘটনার যে দিকগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা হলো–নির্যাতনের শিকার নারীর বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, সহিংসতার স্থান, কার দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছে, অভিযুক্তের বয়স, পেশা, নির্যাতনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয়, সামাজিক ও আইনগত পদক্ষেপ ইত্যাদি। নিচে গণধর্ষণের শিকার নারীদের তথ্য উপাত্ত তুলে ধরা হলো।

গণধর্ষণের শিকার নারী ও কন্যার বয়স:

কন্যার বয়স:

নির্যাতনের শিকার কন্যার বয়স ভাগ করা হয়েছে ৪ ভাগে- ২-৫, ৬-৯, ১০-১৩ এবং ১৪-(-১৮) বছর। গণধর্ষণের ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, মোট ৮৮ জন কন্যার মধ্যে ২-৫ বছর বয়সের শিশু ২%, ৬-৯ বছর বয়সের ৪%, ১০-১৩ বছর বয়সের শিশু ১৬% এবং ১৪-(-১৮) বছর বয়সের ২৫%। প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে ৩০% গণধর্ষণের শিকার কন্যার বয়স হচ্ছে ১৪ থেকে ১৮ বছর। পত্রিকায় বয়স উল্লেখ না থাকার কারণে মাত্র৪৭ জন (৫৩%) কন্যার বয়সের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

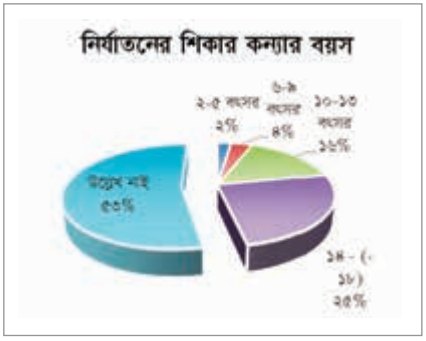

প্রাপ্তবয়স্ক নারীর বয়স:

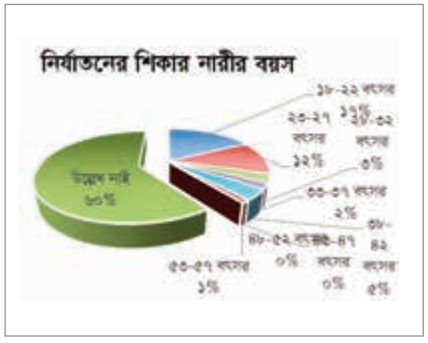

নির্যাতনের শিকার প্রাপ্তবয়স্ক নারীর বয়স ভাগ করা হয়েছে ৮ ভাগে। ১৮-২২, ২৩-২৭, ২৮-৩২, ৩৩-৩৭, ৩৮-৪২, ৪৩-৪৭, ৪৮-৫২ এবং ৫৩-৫৭। ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, মোট ৯৪ জন প্রাপ্তবয়স্ক নারীর মধ্যে ১৮-২২ বছর বয়সের নারী ১৭%, ২৩-২৭ বছরের ১২%, ২৮-৩২ বছরের ৩%, ৩৩-৩৭ বছর বয়সের ২%, ৩৮-৪২ বছর বয়সের ৫% এবং ৫৩-৫৭ বছর বয়সের ১%। পত্রিকায় মোট ৯৪ জন প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর মধ্যে ৩৭ জন নারীর বয়সের তথ্য পাওয়া গেছে। অর্ধেকের বেশি (৬০%) নারীর বয়সের তথ্য উল্লেখ নেই। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, গণধর্ষণের শিকার ১৮ থেকে ২৭ বছর বয়সের নারীরা ২৯%, যা পূর্বের তুলনায় বেশি।

নির্যাতনের শিকার নারীদের বয়সের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কন্যাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গণধর্ষণের শিকার হয়েছে ১৪ থেকে ১৮ বছরের কন্যারা। এসময় তার শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে, মানসিক বিকাশ ঘটে।

এবয়সেই যদি একজন কন্যা গণধর্ষণের মতো পৈশাচিক নির্যাতনের শিকার হয় তবে তার শারীরিক অবস্থার সাথে সাথে মানসিক গঠন পুরোপুরিভাবেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, সংখ্যায় কম হতে পারে, কিন্তু ২-৫ বছরের শিশুও এই নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পায়নি। প্রাপ্ত বয়স্ক নারীদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ১৮ থেকে ২২ বছরের মধ্যে শতকরা ১৭% নারী গণধর্ষণের শিকার হচ্ছে। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, তরুণীরাই সবচেয়ে বেশি গণধর্ষণের শিকার হয়েছে।

গণধর্ষণের শিকার নারী ও কন্যার শিক্ষাগত যোগ্যতা:

পত্রিকায় প্রকাশিত গণধর্ষণের শিকার নারী ও কন্যার শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়,গণধর্ষণের শিকার মোট ৮৮ জন কন্যার মধ্যে স্কুল পর্যায়ে ১ম-৫ম শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে ১৪%; ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে ১৮%। গণধর্ষণের শিকার প্রাপ্তবয়স্ক নারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে খুব অল্প তথ্য পাওয়া গেছে। তবে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় কলেজের ছাত্রীরা ৮% এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ১% ছাত্রী গণধর্ষণের শিকার। ১২৫ জন কন্যা ও শিশুর, যা মোট সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি, শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে কোনো তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি।

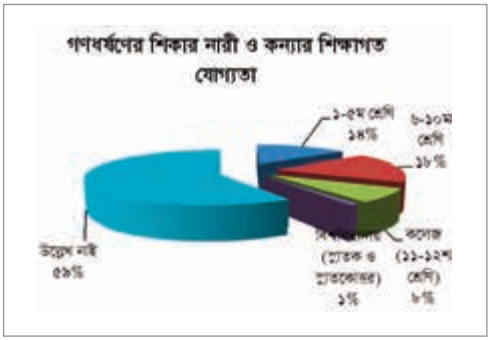

গণধর্ষণের শিকার নারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণে দেখা যায়, স্কুল পর্যায়ের কন্যা গণধর্ষণের শিকার হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ৩২%। বিশেষত ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণিতে পড়ছে এমন কন্যার সংখ্যা বেশি। পেশা, বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণ করে বলা যায়, সকল বয়স ও পেশার নারীরা কমবেশি গণধর্ষণের শিকার হলেও একটি নির্দিষ্ট বয়সের নারীরা, যারা পেশায় ছাত্রী এবং বয়স তুলনামূলকভাবে কম, বেশি গণধর্ষণের শিকার হচ্ছে। যেহেতু পত্রিকার তথ্যের ভিত্তিতে গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, তাই পত্রিকায় উল্লেখ না থাকার কারণে প্রাপ্তবয়স্ক নারীর বড় একটা অংশের শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য অজানা রয়ে গেছে।

গণধর্ষণের শিকার নারী ও শিশুর পেশা :

গণধর্ষণের শিকার হয়েছে সর্বমোট ১৮২ জন নারী ও কন্যা। তার মধ্যে নারী ৯৪ জন এবং কন্যা ৮৮ জন। এই ৯৪

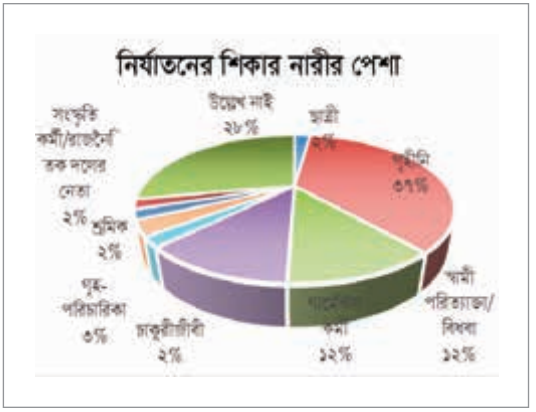

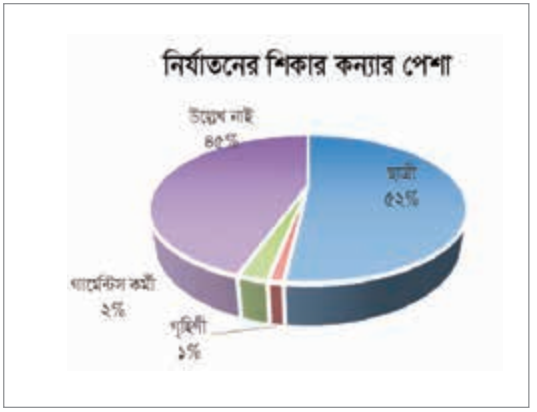

জন প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর মধ্যে গণধর্ষণের শিকার ছাত্রীর সংখ্যা ২%, গৃহিণী ৩৭%, গার্মেন্টস কর্মী ১২%, স্বামীপরিত্যক্তা/বিধবা ১২%, চাকুরিজীবি ২%, গৃহপরিচারিকা ৩%, শ্রমিক ২% এবং সংস্কৃতিকর্মী/রাজনৈতিক দলের নেতা ২% ।

পাশাপাশি কন্যার ক্ষেত্রে দেখা যায়, ছাত্রী ৫২%, গার্মেন্টস কর্মী ২%, এবং গৃহিনী ১% । পত্রিকায় নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যার পেশাগত তথ্য উল্লেখ না থাকার কারণে ২৭% প্রাপ্ত বয়স্ক নারী ও ৩৮% কন্যার পেশা জানা সম্ভব হয়নি।

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিভিন্ন পেশার প্রাপ্ত বয়স্ক নারীরা গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। তবে প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শিকার হয়েছে গৃহিণী ৩৭% । যা কর্মজীবী নারীদের তুলনায় অনেক বেশি। উদ্বেগজনক ও আশঙ্কাজনক হচ্ছে প্রাপ্ত বয়স্ক নারী ও কন্যার পেশাভিত্তিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রাপ্ত বয়স্কদের তুলনায় অর্ধেকের বেশি কন্যা গণধর্ষণের শিকার হয়, যারা পেশায় ছাত্রী (৫২%)।

ঘটনার স্থানঃ

ঘটনার স্থান হিসেবে এখানে মেট্রোপলিটন এলাকা, জেলা শহর, উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম এই ৪ টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। গণধর্ষণের ঘটনাগুলোর মধ্যে মেট্রোপলিটন এলাকায় ঘটেছে ৮%; জেলা শহরে ২৪%; উপজেলা পর্যায়ে ৪৬%,যা সর্বোচ্চ সংখ্যা এবং গ্রাম পর্যায়ে, ২২% ।

নির্যাতনের ঘটনা গ্রামে না শহরে বেশি তার চেয়ে বেশি উদ্বিগ্নের বিষয় হল বাংলাদেশের সর্বত্রই নারী গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। কখনো মেট্রোপলিটন এলাকায়, কখনো জেলা শহর, কখনো উপজেলা এবং কখনো গ্রামাঞ্চলে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্যাতনের শিকার নারীর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নির্যাতনের শিকার অধিকাংশ নারী হচ্ছে উপজেলা ও গ্রামে বসবাসকারী। এর কারণ হিসাবে বলা যায়, গ্রামীণ সমাজে একে অপরের সাথে পরিচিতি মেট্রোপলিটন এলাকার তুলনায় বেশি হওয়ায় নির্যাতনের ঘটনা স্থানীয় সমাজে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যার ফলেসংবাদপত্রেও উপজেলা ও গ্রাম এলাকার নির্যাতনের ঘটনা অধিক হারে আসে।

অভিযুক্ত সম্পর্কে তথ্য ঃ

কার দ্বারা নির্যাতনের শিকারঃ

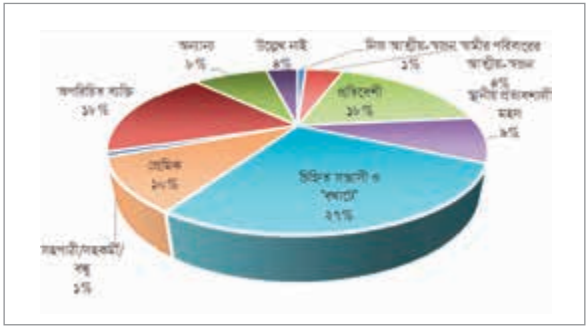

১৮২ টি গণধর্ষণের ঘটনায় ১৭১টি ঘটনার অর্থাৎ বেশির ভাগ ঘটনায় অভিযুক্তের পরিচয় পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে দেখা যায়, কন্যা ও নারী সবচেয়ে বেশি গণধর্ষণের শিকার হয় এলাকার বখাটে বা সন্ত্রাসীদের দ্বারা ২৭% ।পরবর্তীতে উল্লেখযোগ্য হারে বেশি নির্যাতনের শিকার হয় প্রতিবেশী দ্বারা ১৮%, অপরিচিত ব্যক্তি দ্বারা ১৮% এবং প্রেমিক ১০% দ্বারা । নিজ আত্মীয়-স্বজন দ্বারা ১%; স্বামীর পরিবারের আত্মীয়-স্বজন দ্বারা ৪%; স্থানীয়

প্রভাবশালী মহলের দ্বারা ৯% এবং সহপাঠী/সহকর্মী/বন্ধু দ্বারা ১% নারী ও কন্যাগণধর্ষণের শিকার হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণে দেখ যায়, নারী পরিচিত ব্যাক্তি দ্বারা সবচেয়ে বেশি গণধর্ষণের শিকার হয়ে থাকে। নারী কখনও কাছের মানুষ, আত্মীয়-স্বজন, সহপাঠী, প্রেমিক বা এলাকার পরিচিত লোকদের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়। কিন্তু অন্যদিকে অপরিচিত ব্যাক্তি দ্বারা গণধর্ষণের শিকার হওয়ার সংখ্যাও কম নয়। এই পশুবৃত্তিক মনোভাব পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির জঘন্য প্রকাশ।

গণধর্ষণের মতো একটা জঘন্য পশুবৃত্তিক অপরাধ যখন নিজের পরিবারের লোকজন করে এবং অপরাধের শিকার হয় ৫ বছরের কন্যা থেকে পঞ্চাশোর্ধ নারী তা কতটা অমানবিক ও উদ্বেগজনক তা সহজেই অনুমান করা যায়।

অভিযুক্তের বয়স :

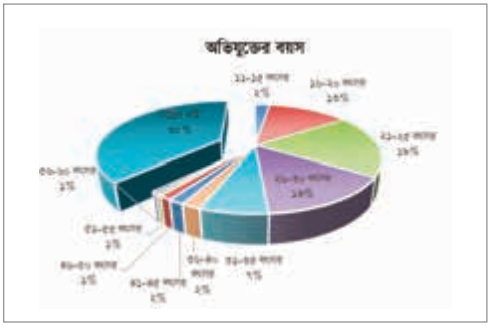

অভিযুক্তের বয়সসীমার ক্ষেত্রে ১১-১৫ বছর বয়সী অভিযুক্ত রয়েছে ২%, ১৬-২০ বয়সসীমার মধ্যে রয়েছে ১৩%, ২১-২৫ বৎসর বয়সসীমার মধ্যে রয়েছে ১৯%; ২৬-৩০ বৎসর ১৪%; ৩১-৩৫ বৎসর বয়সের ৭%; ৩৬-৪০ বৎসর বয়সী ২%; ৪১-৪৫ বৎসর বয়সের ১% ; ৪৬-৫০ বৎসর বয়সের ১%; ৫১-৫৫ বৎসর বয়সের ১% এবং ৫৬-৬০ বৎসর বয়সের ১%।

সমীক্ষায় দেখা যায়, ৩৮% অভিযুক্ত ব্যাক্তির বয়সের তথ্য পাওয়া যায় নি। যাদের বয়সের তথ্য পাওয়া যায় নি তাদেরকে বাদ দিয়ে দেখা যায়, মোট (৬২%) প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে গণধর্ষণকারীর প্রায় অর্ধেকের বেশির বয়স ১৬ থেকে ৩০ বৎসরের মধ্যে (৪৮%)। অর্থাৎ অধিকাংশ গণধর্ষণকারী বয়সে তরুণ ও যুবক। অন্যদিকে গণধর্ষণের শিকার নারীও বয়সে তরুণী। মূল্যবোধের অবক্ষয়, মাদক ও তথ্য প্রযুক্তি অপব্যবহারের কারণে তরুণ ও যুব সমাজ এই ধরনের অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ছে এবং গণধর্ষণের মত ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে যার কারণে তাকে সারাটা জীবন একটা ট্রমার মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

অভিযুক্তের পেশা :

১৮২ টি গণধর্ষণের ঘটনার মধ্যে বেশির ভাগ ঘটনায় (৭১%) অভিযুক্তের পরিচয় পাওয়া যায় নি। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, কন্যা ও নারী সবচেয়ে বেশি গণধর্ষণের শিকার হয়েছে শ্রমিক ও স্থানীয় বখাটে বা সন্ত্রাসীদের দ্বারা ১২%। রাজনীতির সাথে জড়িত ব্যাক্তি দ্বারা ৪%, চাকুরিজীবী দ্বারা ২%, চালক দ্বারা ২%, ছাত্র দ্বারা ১%; পুলিশ দ্বারা ২%; ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ৩% গণধর্ষণের শিকার হয়েছে।

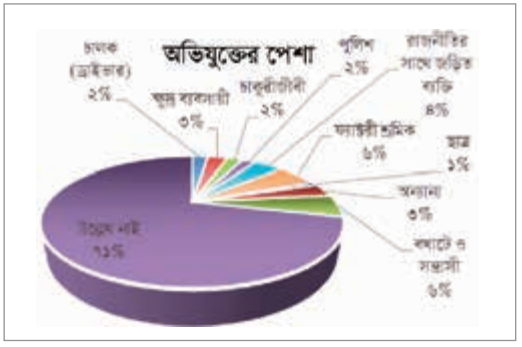

অর্ধেকের বেশি সংখ্যক ঘটনার তথ্য পাওয়া যায়নি । মাদক, ইন্টারনেট ও স্মার্ট ফোনের অপব্যবহারের মাধ্যমে এই ঘৃণ্য অপরাধের মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। নারীরা স্কুলে আসা যাওয়া, ঘরের বাইরে চলাচল করতে গিয়ে ইভটিজিং, যৌন হয়রানি, ধর্ষণের চেষ্টা, ধর্ষণ ও গণধর্ষণের মত বর্বর নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন আবার পাশাপাশি অনাকাঙ্খিত স্পর্শ, বিভিন্ন ধরনের অঙ্গভঙ্গি, কটুক্তিসহ নানা ধরনের যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন এলাকার বখাটে ও সন্ত্রাসীদের

দ্বারা। অপরদিকে পুলিশ দ্বারা ২% নারী গণধর্ষণের শিকার হচ্ছে, সংখ্যায় হয়ত কম কিন্তু আইনরক্ষাকারী বাহিনী দ্বারাও নারী সুরক্ষিত নয়, বিষয়টি খুব উদ্বেগজনক।

গণধর্ষণের শিকার নারী ও কন্যার উপর নির্যাতনের প্রভাবঃ

এখানে শারীরিক প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে হত্যার চেষ্টা, এসিড নিক্ষেপ, গুরুতরভাবে আহত হওয়া। মানসিক প্রভাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা অথবা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা বা নিরাপত্তাহীনতার কারণে পালিয়ে বেড়ানো। গণধর্ষণের শিকার কন্যা ও নারী যে ভাবে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা হচ্ছে, ব্ল্যাকমেইলিং এর শিকার, হাসপাতালে ভর্তি, কাজে যাওয়া বন্ধ, চাকুরী হতে বরখাস্ত ইত্যাদি। আর সামাজিক প্রভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কন্যাদের বাল্য বিয়ে দিতে অভিভকরা যখন বাধ্য হচ্ছে, লোকলজ্জার কারণে কন্যাদের স্কুল/কলেজ বা বাইরে যাওয়া বন্ধ, অভিযুক্তরা নির্যাতনের শিকার কন্যা ও নারীর সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে সামাজিকভাবে হেয় করছে ইত্যাদি।

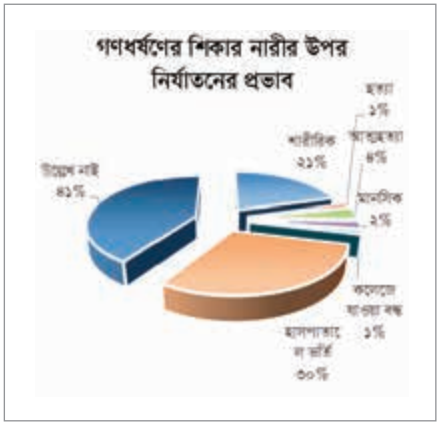

কন্যাদের ক্ষেত্রে গণধর্ষণের শিকার হয়ে ***শারীরিকভাবে*** ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১৪% এবং ২৫% হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে । হত্যা করা হয়েছে ৫%; আত্মহত্যা করেছে ১%। গণধর্ষণের শিকার হয়ে অল্প বয়সে গর্ভধারণের শিকার হয়েছে ৪%। ***অর্থনৈতিকভাবে*** ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১%। ***সামাজিকভাবে*** ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ১%, মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩% এবং লোকলজ্জার ভয়ে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছে ৫%, যা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পয়েছে।

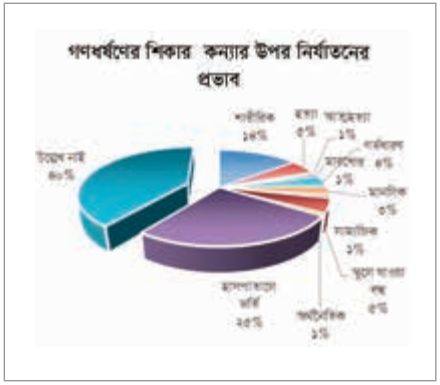

পাশাপাশি প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর ক্ষেত্রে গণধর্ষণের শিকার হয়ে ***শারীরিকভাবে*** ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২১%। এদের মধ্যে হত্যা করা হয়েছে ১%, আত্মহত্যা করেছে ৪%, কলেজে যাওয়া বন্ধ ১%। ৩০% নারী বা তার পরিবার নির্যাতনের শিকার হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

গণধর্ষণের শিকার নারী ও শিশুর উপর নির্যাতনের প্রভাবের তুলনামূলক চিত্র পর্যবেক্ষণে দেখা যাচ্ছে, সামগ্রিক দিক থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর ও কন্যা ***শারীরিকভাবে*** ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে প্রায় কাছাকাছি, যথাক্রমে ৩০% ও ২৫% ক্ষেত্রে। তবে গণধর্ষণের পর হত্যার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর তুলনায় শিশুর হার বেশি। প্রাপ্ত বয়স্ক নারী ১%, সেখানে কন্যা ৫%।

সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, গণধর্ষণের শিকার নারী ও কন্যার উপর মানসিক, শারীরিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই এর প্রভাব পড়ে। গণধর্ষণের শিকার হয়ে যেসব নারী ও কন্যা হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে তারা শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির সাথে অর্থনৈতিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সমাজে লোকলজ্জার ভয়ে, অপমান সহ্য করতে না পেরে প্রাপ্ত বয়স্ক নারী আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। কিন্তু এই ঘটনার জন্য ঐ নারী দায়ী নয়। গবেষণায় আরও দেখা যাচ্ছে, ৪% কন্যা গণধর্ষণের শিকার হওয়ার পর গর্ভধারণ করছে। সংখ্যায় কম হলেও বিষয়টি উদ্বেগজনক। কারণ শিশুটি গণধর্ষণের মতো ভয়াবহ নির্যাতনের ফলেই মানসিকভাবে অনেকখানি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এরপর যদি সে আবার

গর্ভধারণ করে, যখন সে শারীরিকভাবেও প্রস্তুত নয় তখন সে একধরনের ট্রমার মধ্যে চলে যায়। যা তার স্বাভাবিক জীবনযাপনকে ব্যাহত করে এবং অনেকেই আর সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে না।

আইনগত পদক্ষেপ :

গণধর্ষণের ১৮২টি ঘটনার মধ্যে দেখা যায়, প্রায় অর্ধেক (৪৭%) ঘটনার মামলা করা হয়েছে এবং মামলা হয়নি ২১%।

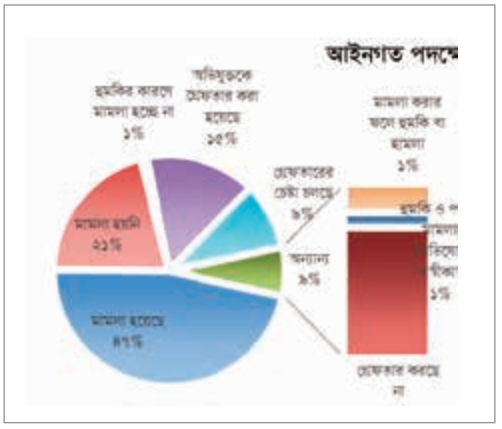

সমস্ত ঘটনার তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি। মামলা না হওয়ার কারণ হচ্ছে অভিযুক্তের বা তার পরিবারের হুমকি ও পাল্টা হামলা, অভিযোগ অস্বীকার এরূপ ঘটনা ৩%। গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে ৯% ক্ষেত্রে, গ্রেফতার করছে না ৫%, গ্রেফতার বা আটক করেছে ১৫%। মামলা করা এবং অভিযুক্তকে গ্রেফতার করার হার পূর্বের থেকে বৃদ্ধি পেলেও অপরাধীকে সুষ্ঠ বিচারের আওতায় আনা, উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করার ক্ষেত্রে সেই সংখ্যা অনেক কম। যথাযথ সময়ে বিচার না হওয়ার কারণে নির্যাতনের শিকার নারী ও তার পরিবার, পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে এবং অন্যদিকে অপরাধীদের মধ্যে আরও অপরাধ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

স্থানীয় প্রতিক্রিয়া:

গণধর্ষণের ঘটনায় ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে স্থানীয় জনগণ/কর্তৃপক্ষ, নির্যাতনের শিকার নারীর নিজ আত্মীয় স্বজন, নারী ও মানবাধিকার সংগঠন, পুলিশ কর্মকর্তা এবং ইউপি চেয়ারম্যান। দেখা যায় বেশিরভাগ ঘটনায় স্থানীয় জনগণ অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে এবং অন্যদিকে নির্যাতনের মামলা নেওয়া, ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পুলিশ কর্মকর্তারা পূর্বের চেয়ে বেশি ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। নেতিবাচক ভূমিকার ক্ষেত্রে থানা/পুলিশ (১০টি ঘটনা), স্থানীয় জনগণ/কর্তৃপক্ষ(৩টি ঘটনায়) এবং রাজনৈতিক/প্রভাবশালী ব্যক্তি (১৪টি ঘটনায়)। পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, স্থানীয়, সামাজিক, সাংগঠনিক ও দায়িত্ববাহকদের প্রতিক্রিয়ায় গণধর্ষণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকার চেয়ে ইতিবাচক ভূমিকার হার বেশি।

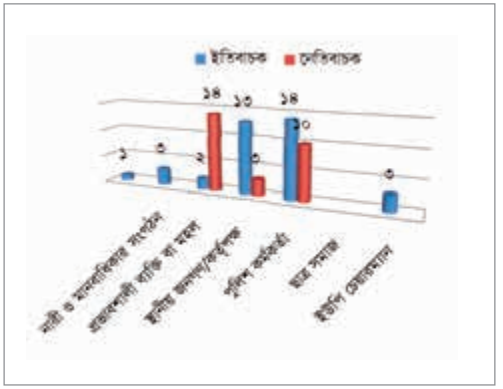

অভিযুক্তের অভিভাবক/ আত্মীয়-স্বজনদের ভূমিকা:

অভিযুক্তের আত্মীয়-স্বজনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের ভূমিকা রয়েছে। এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা গুলো হচ্ছে, অভিভাবক নিজে বাদী হয়ে মামলা করেছে, শাসন করেছে অথবা অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছে। নেতিবাচক ভূমিকা হলো, নির্যাতনের শিকার নারী বা তার পরিবারকে হুমকি দিয়েছে, অভিযোগ অস্বীকার করেছে, নির্যাতনকারীকে সমর্থন দিচ্ছে, টাকার বিনিময়ে মীমাংসা করছে। অভিযুক্তের পরিবার প্রভাবশালী হওয়ায় সালিশ মানছে না ইত্যাদি।

সালিশের পদক্ষেপ /সামাজিকভাবে মীমাংসা

গণধর্ষণের মত ঘটনা ঘটার পরও অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক উদ্যোগে ঘটনার মীমাংসা করার চেষ্টা করা হয়। তবে দেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ ধরনের মীমাংসার উদ্যোগ নেয়া হয় ঘটনা ধামাচাপা দেয়া বা অভিযুক্তকে রক্ষা করার জন্য, তাই অভিযুক্তকে নামেমাত্র শাস্তি দেয়া হয় আবার কখনো কখনো নির্যাতনের শিকার নারীকে শাস্তি প্রদান করা হয়। যেখানে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে খুব কম ক্ষেত্রে। বরং নির্যাতনের শিকার নারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টাও করা হয়েছে।

অভিযুক্ত দ্বারা পরিবার/অন্য কেউ আক্রান্ত:

এমনকি ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে অভিযুক্তের আক্রোশের শিকার হতে হয় অনেক সময়। যেখানে, মারধোর/ পিটিয়ে আহত করা হয়েছে, ছুরিকাঘাত করে রক্তাক্ত জখম করা, প্রতিবাদ করায় নির্যাতিতার পরিবাবের বা বাড়িঘরে হামলা করা ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায়

তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল

বাংলাদেশে বিগত বছরগুলোতে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। নারী ও শিশুর নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি এখন আমাদের দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রাপ্তবয়স্ক থেকে অপ্রাপ্তবয়স্ক কোনো অবস্থাতেই কোথাও নিরাপদে নেই নারী ও শিশু। সেটা হতে পারে গ্রামে অথবা শহরে, রাস্তাঘাটে, গণপরিবহণে, সুরম্য অট্টালিকা অথবা জরাজীর্ণ বস্তিতে, বিদ্যালয়ে অথবা নিজের বাড়িতে। দেশে নারী ও শিশু অধিকার সুরক্ষায় কঠোর আইন রয়েছে। তারপরও প্রতিনিয়তই দেশের কোথাও না কোথাও নারী ও শিশুরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

সংবাদপত্রের পাতায় অথবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নারী ও শিশুকে পাশবিক নির্যাতন (ধর্ষণ), হত্যা, গুম, অপহরণের খবর প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের লিগ্যালএইড উপপরিষদ কর্তৃক সংরক্ষিত ১৪টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সংবাদের ওপর ভিত্তি করে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়, যার চিত্র খুবই ভয়াবহ ও উদ্বেগজনক।

২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১,৭৮৪ জন নারী ও শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ধর্ষণ ১,৩৯১টি, গণধর্ষণ ১৮২টি এবং ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে ২১১টি। ২০১৮ সালে এই সংখ্যা ছিল ১,০০৭। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় ২০১৯ সালে প্রায় দ্বিগুণ নারী ও শিশু ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যার বয়স পর্যালোচনা করে দেখা যায়, পাঁচ বছর কিংবা তার চেয়ে কম বয়সের শিশু কন্যাও যেমন ধর্ষণের শিকার হয়েছে তেমনি ৫০ উর্দ্ধ নারীরও এই সহিংসতার হাত থেকে নিস্তার পাননি। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রায় অর্ধেক ক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার নারীর বয়স উল্লেখ থাকে না। যাদের বয়স উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে **নারীর তুলনায় কন্যারা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে বেশি। এদের বড় অংশেরই বয়স ১০ বছরের নীচে।** ধর্ষণ ও ধর্ষণের চেষ্টা উভয় ক্ষেত্রে ৬-৯ বৎসর বয়সের কন্যারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে বেশি যথাক্রমে তা ১৮% ও ১১%। গণধর্ষণের ক্ষেত্রে, ১৪-১৮ বৎসর বয়সের কন্যারা (২৫%) নির্যাতনের শিকার হচ্ছে বেশি। নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যার শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে। শিশুর মানসিক বিকাশে বিঘ্ন ঘটে। অল্প বয়সেই যদি একজন কন্যা গণধর্ষণের মতো পৈশাচিক নির্যাতনের শিকার হয় তবে তার শারীরিক অবস্থার সাথে সাথে মানসিক গঠন পুরোপুরিভাবেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, সংখ্যায় কম হলেও ২-৫ বৎসরের শিশুও এই নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পায়নি। অপরদিকে, প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ধর্ষণ, গণধর্ষণসহ যৌন নির্যাতনের শিকার প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি তরুণী অর্থাৎ তাদের বয়স ১৮-৩০ বছরের মধ্যে।

নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যার **শিক্ষাগত যোগ্যতা** বিশ্লেষণে দেখা যায়, **স্কুল পর্যায়ের কন্যারা সবচেয়ে বেশি যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে**। বিশেষ করে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণিতে পড়ছে এমন কন্যার সংখ্যাই বেশি। ধর্ষণের ক্ষেত্রে ১ম–৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ১৫% এবং ৬ষ্ঠ–১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ২০%। ধর্ষণ চেষ্টার ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ১ম–৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ১৫% এবং ৬ষ্ঠ–১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ১৮% কন্যা। অপরদিকে, গণধর্ষণের ক্ষেত্রে, মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত অর্থাৎ ৬ষ্ঠ–১০ম শ্রেণি পর্যন্ত সংখ্যাটা বেশি। উল্লেখ্য যে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে সাধারণত কর্মজীবী নারী ও গৃহিণীর শিক্ষাগত যোগ্যতার উল্লেখ থাকে না।

বিশ্লেষণে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ধর্ষণের শিকার নারীর বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। ২–১৩ বছরের কন্যারা সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। আবার এদেরই বড় একটা অংশের বয়স ১০–১৩ বৎসরের মধ্যে। অপরদিকে, একই চিত্র লক্ষ্য করা যায় শিক্ষার ক্ষেত্রেও। ১ম–১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ধর্ষণের শিকার কন্যার হার বেশি এবং যার মধ্যে ৬ষ্ঠ–১০ম শ্রেণি পড়ুয়া কন্যাদের সংখ্যা বেশি। সমাজে বিদ্যমান লিঙ্গ বৈষম্য কাটিয়ে উঠে জেন্ডার সমতার জন্য নারী শিক্ষার পরিধি বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক। কিন্তু ক্রমবর্ধমান নারী ও কন্যার প্রতি যৌন নির্যাতন পরিস্থিতি তার অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে।

নারীর মর্যাদার ক্ষেত্রে পেশাগতভাবে তেমন কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। এর কারণ হল নারীর প্রতি পুরুষের অধস্তন দৃষ্টিভঙ্গী। এর যথার্থতা লক্ষ্য করা যায় নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যার পেশাগত তথ্য থেকে। কেননা স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে সকল পেশায় নিয়োজিত নারী ধর্ষণের মত ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার। নারী হওয়াটাই যার একমাত্র কারণ। সমীক্ষায় দেখা যায়, অপ্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বেশির ভাগই হল শিক্ষার্থী। ধর্ষণের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ৬৪% এবং গণধর্ষণের ক্ষেত্রে ৫২%। গার্মেন্টসকর্মী, বিভিন্ন কারখানার শ্রমিক ও গৃহপরিচারিকা লক্ষণীয়ভাবে নির্যাতনের ঝুঁকিতে রয়েছে।

কাজের সূত্রে ঘরের বাইরে বের হলেই কর্মজীবী নারীরা সহিংসতার শিকার বেশি হবে তা নয়। বরং সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, পরিবার বা ঘরের মত সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থলে নারীরা সবচেয়ে বেশি অনিরাপদ ও সহিংসতার শিকার। নারী কোথাও নিরাপদ নয়–না ঘরে, না বাইরে। কেননা প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যাচ্ছে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও ধর্ষণের চেষ্টাসহ সকল ক্ষেত্রে গৃহিণীরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। ধর্ষণের ক্ষেত্রে ৩২%, গণধর্ষণের ক্ষেত্রে ৩৭% এবং ধর্ষণের চেষ্টায় ৪৬% গৃহিণী ঘটনার শিকার।

পেশা, বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণ করে বলা যায় সকল বয়স ও পেশার নারীরা কমবেশি ধর্ষণের শিকার হলেও একটি নির্দিষ্ট বয়সের নারীরা, যারা পেশায় ছাত্রী এবং বয়স তুলনামূলকভাবে কম তারাই, ধর্ষণের মত যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে বেশি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ধর্ষণের সকল ঘটনা প্রকাশিত হয় না। কিছু ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নির্যাতনের ঘটনা গ্রামে না শহরে বেশি, তার চেয়ে বেশি উদ্বিগ্নের বিষয় হলো বাংলাদেশের সর্বত্রই নারী ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। কখনো মেট্রোপলিটন এলাকায়, কখনো জেলা শহর, কখনো উপজেলা আবার কখনো গ্রামাঞ্চলে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে নির্যাতনের শিকার নারীর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, **নির্যাতনের শিকার অধিকাংশ নারী উপজেলা ও গ্রামে বসবাসকারী।** ধর্ষণের ক্ষেত্রে অর্ধেক ঘটনাই সংগঠিত হয়েছে উপজেলা পর্যায়ে, ৫০% ও গ্রাম এলাকায় ২৬%। গণধর্ষণের ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে ৪৬% ও গ্রাম পর্যায়ে ২২% এবং ধর্ষণের চেষ্টায় উপজেলায় ৪৪% ও গ্রাম এলাকায় ২৯%। এর কারণ হিসাবে বলা যায়, মেট্রোপলিটন এলাকার তুলনায় গ্রামীণ সমাজে একে অপরের সাথে পরিচিতি বেশি হওয়ায় নির্যাতনের ঘটনা স্থানীয় সমাজে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যার ফলে সংবাদপত্রেও উপজেলা ও গ্রাম এলাকার নির্যাতনের ঘটনা অধিক হারে আসে।

বর্তমানে ভয়াবহ হারে বেড়ে চলেছে নারী ও কন্যার ওপর ধর্ষণের ঘটনা। বেশির ভাগ ঘটনার শিকার হচ্ছে কন্যারা। **অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী বা কন্যা ধর্ষণের শিকার হয় পরিচিত মানুষজন, নিকট আত্মীয় অথবা প্রতিবেশীদের দ্বারা।** প্রতিবেশীদের দ্বারা একটি কন্যাদের একটা বড় অংশ ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, এ হার ধর্ষণের ক্ষেত্রে ৪৫%, গণধর্ষণের ক্ষেত্রে ১৮% এবং ধর্ষণের চেষ্টার ক্ষেত্রে ২৪%। প্রতিবেশীদের হাতে ধর্ষণের শিকার শিশুদের বয়স তুলনামূলক কম। দুই বছরের কম বয়সের শিশুও প্রতিবেশীর দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এসব ঘটনার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ খেলতে গিয়ে বা নিজের বাড়িতে ঘটে, বিশেষ করে কন্যাদের ক্ষেত্রে বাসায় একা পেয়ে বা চকলেট দেওয়া, কার্টুন দেখা, খেলা বা বেড়াতে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ করা হচ্ছে। শিশুরা তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তাদের প্রতিরোধের ক্ষমতাও কম এবং প্রতিবেশী- পরিচিতজনদের হাতের নাগালেও থাকে। তাছাড়া শিশুদের ভয় দেখালে সহজে কাউকে ঘটনার কথা বলতে পারবে না, এই ভেবে ধর্ষক নিজেকে নিরাপদ মনে করে। কিন্তু এই ভয়াবহ ঘটনার কারণে কন্যারা হারিয়ে ফেলে তার মধুর শৈশব। মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সারাজীবনের জন্য।

তথ্য বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, **প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। কিশোরীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এ ধরনের ঘটনার শিকার।** ধর্ষণের ক্ষেত্রে ১৫%, গণধর্ষণের ক্ষেত্রে ১১% এবং ধর্ষণের চেষ্টার ক্ষেত্রে ৯% কন্যারা তাদের সহপাঠী ও প্রেমিকদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়েছে। কিশোরীরা পরিবারের গণ্ডি পেরিয়ে, স্মার্ট ফোন বা সহজলভ্য

ইন্টারনেটের কারণে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে বিয়ের প্রলোভনে বা আবেগের ফাঁদে পড়ে ধর্ষণের শিকার হয়।

তাছাড়াও স্কুলে আসা ও যাওয়ার পথে প্রেমের প্রস্তাব বা বিয়ের প্রস্তাবে রাজী না হওয়া বা কোনো কুপ্রস্তাবে সাড়া না দেয়ার কারণে, বিয়ে বা চাকরির প্রলোভনে পড়ে, ভয় দেখিয়ে বা জোরপূর্বক নারী বা কন্যারা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে এলাকার বখাটে ও সন্ত্রাসী, স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি বা অপরিচিতজনদের দ্বারা। **গণধর্ষণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশির ঘটনায় (২৭%) অভিযুক্ত হচ্ছে এলাকার বখাটে ও সন্ত্রাসীরা, যা সবোর্চ্চ।**

ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তদের বয়সের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কিশোর থেকে শুরু করে ষাটোর্ধ্ব পুরুষও রয়েছে অভিযুক্তের তালিকায়। প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, **ধর্ষণের মতো নির্যাতনের ঘটনায় তরুণ সমাজের সম্পৃক্ততা বেশি। অভিযুক্তদের মধ্যে ১১–৩০ বছর বয়সের মধ্যে মোট ৩২%, তবে ২১–২৫ বছর বয়সের সবচেয়ে বেশি। গণধর্ষণকারীর প্রায় অর্ধেকের বেশির বয়স ১৬ থেকে ৩০ বৎসরের মধ্যে (৪৮%)।** সহজলভ্য ইন্টারনেট, স্মার্টফোন ও সর্বোপরি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম–এসব কিছুতে সবচেয়ে বেশি বিচরণ করে তরুণসমাজ। তাই ঝুকিটাও বেশি। তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ ব্যবহারের কারণে ইন্টারনেট ও স্মার্টফোনে সবাই খুব সহজেই যা ইচ্ছে তাই দেখতে পাচ্ছে। এ থেকে মন্দের চর্চা করছে তরুণরাই বেশি। ফলে এ ধরণের অনৈতিক কর্মকাণ্ড ঘটাচ্ছে তারা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এখন সবচেয়ে বড় অসামাজিক মাধ্যমে রূপ নিয়েছে। যার ফলে তরুণসমাজের নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটছে এবং তারা ধর্ষণের মত জঘন্য অপরাধসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। যে তারুণ্য পরিবার, দেশ ও সমাজকে প্রযুক্তির ছোঁয়ায় উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়ার কথা, আজ তাদের বড় একটা অংশ ধর্ষণের মত নির্যাতনে সম্পৃক্ত হচ্ছে।

তাছাড়াও **ধর্ষণের শিকার নারী ও কন্যার বয়স ও অভিযুক্তের বয়স পাশাপাশি তুলনা করলে দেখা যায়, যারা পেশায় ছাত্রী বা বয়সে তরুণী অর্থাৎ যাদের বয়স ২৫ বছরের মধ্যে তারাই সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। অপরদিকে ধর্ষণের ঘটনায় তরুণদের সম্পৃক্ততা সবচেয়ে বেশি, যাদের বয়স ১৬–৩০ বছরের মধ্যে।** এ ধরণের ভয়াবহ চিত্র উদ্বেগজনক।

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, নারী ও কন্যা প্রতিবেশী এবং নিজ আত্মীয়-স্বজন অর্থাৎ পরিচিতজনদের দ্বারাই বেশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। অন্যদিকে, **ধর্ষণের ক্ষেত্রে অভিযুক্তের পেশার মধ্যে চালক ৭%, ক্ষুদ্র** ব্যবসায়ী (মুদি দোকানদার, স্টেশনারি বিক্রেতা ইত্যাদি) ৬%, শিক্ষক ৪% ও এলাকার বখাটে ৫%, যারা সবাই ধর্ষণের শিকার নারী ও কন্যার পরিচিত গণ্ডির মধ্যেই থাকে। শিক্ষক দ্বারা ধর্ষণের চেষ্টার শিকার ১৩% কন্যা। গণধর্ষণ, যেখানে কয়েকজন সংঘবদ্ধভাবে ক্ষমতারজোরে এই ঘটনা ঘটিয়ে থাকে, কন্যা ও নারী সবচেয়ে বেশি গণধর্ষণের শিকার হয়েছে শ্রমিক ও স্থানীয় বখাটে বা সন্ত্রাসীদের দ্বারা ১২% এবং রাজনীতির সাথে জড়িত ব্যক্তি ৪%। অর্থাৎ স্কুলে বা বাইরে যাওয়া-আসার পথে বখাটে বা পরিবহণ চালক, এমনকি বিদ্যালয়ে যিনি শিক্ষা দিবেন তিনিসহ প্রক্যেতটি ক্ষেত্র নারী ও কন্যার জন্য সবচেয়ে বেশি অনিরাপদ ও ভয়ংকর ঝুকিপূর্ণ। যা খুবই উদ্বেগজনক, কেননা এটি নারীর ক্ষমতায়নের পথে শক্ত প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।

যেকোন নির্যাতনের শিকার নারীদের উপর নির্যাতনের প্রভাব বিভিন্নভাবে পড়ে। এই প্রভাব শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক। ধর্ষণের কারণে শারীরিকভাবে আহত হওয়া, এমনকি ধর্ষণের পর হত্যা করা, অন্তসত্ত্বা হওয়া ইত্যাদি প্রভাব উল্লেখযোগ্য। যার ফলে ধর্ষণের শিকার নারী ও কন্যাদের স্কুল, কলেজে বা কর্মক্ষেত্রে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তির কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। আবার সামাজিকভাবে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যেমন-লোকলজ্জার ভয়ে বাইরে যাওয়া বা পড়াশুনা বন্ধ, কুৎসা রটনা, বিয়ের সমস্যা ইত্যাদি। ফলস্বরূপ বাল্যবিয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়-যা নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রতিবন্ধক।

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ধর্ষক শুধু ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয় না, ধর্ষণের শিকার নারী ও তার পরিবারের উপর চালায় আরও নানা ধরনের অমানবিক নির্যাতন। ধর্ষণের শিকার নারী ও তার পরিবারকে সরাসরি হুমকি ও ভয়-ভীতি প্রদান, মামলা করার ফলে মারধোর, হামলার শিকার, থানা ও পুলিশের পক্ষ থেকে অসহযোগিতা, স্থানীয় জনগণের পক্ষ থেকে অসহযোগিতা এবং রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের ক্ষমতার প্রভাব প্রভৃতি কারণে নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যার মানসিক ট্রমার সৃষ্টি হয়। ফলে তারা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে এবং আত্মহত্যার চেষ্টা করে। নারীর প্রতি নির্যাতনের ধরণগুলো সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। অপরাধী ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহার করে ধর্ষণের দৃশ্য ভিডিও করে নারীকে ব্লাকমেইল করছে। যাতে নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যা মানসিক ও সামাজিকভাবে আরও বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। ধর্ষণের শিকার নারীর উপর সকল ধরণের প্রভাব একই সঙ্গে পড়ে। একটি বিশেষ ক্ষেত্রেই ধর্ষণের প্রতিক্রিয়া রয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। সামগ্রিকভাবে সারাজীবন নারীর সুস্থ স্বাভাবিক জীবন-যাপন বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

সমীক্ষায় ধর্ষণের ঘটনার বিশ্লেষণে আইনগত ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক দিক লক্ষ্য করা যায়। তা হচ্ছে বেশির ভাগ ঘটনায় ক্ষেত্রে মামলা হয়েছে এবং খুব কম ক্ষেত্রে মামলা হয়নি। কিন্তু ঘটনার মামলা হওয়াটাই কি যথেষ্ট? যদি তাই হতো নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেত না। প্রতি বছর নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার হার বৃদ্ধি পাবার উল্লেখযোগ্য কারণ হল, বিচারহীনতা ও বিচারপ্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা। প্রতিবছর যে পরিমাণ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে, সে তুলনায় বিচারের হার অত্যন্ত কম। অনেক ধর্ষণের ঘটনায় ধর্ষণের শিকার নারী ও তাঁর পরিবার সামাজিক সম্মানহানির আশঙ্কায় তা প্রকাশ করে না। ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধ করেও অপরাধী ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয় না, অধিকাংশ ধর্ষক শাস্তি পায় না। যদিও তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয় বা তারা গ্রেফতার হয় কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা বিচার ও শাস্তি এড়িয়ে চলাচল করতে সক্ষম হয়।

বাংলাদেশে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মামলা প্রক্রিয়ায় তদন্ত, ধর্ষণের মেডিকেল রিপোর্ট ও আইনজীবীর অনাগ্রহ বা পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে চূড়ান্ত রায়ে মামলার নিষ্পত্তি হয়ে যায়। আইনগতভাবে তদন্ত কর্মকর্তাদের ৯০ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষে চূড়ান্ত চার্জ দেওয়ার কথা থাকলেও পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে অথবা প্রভাবশালী মহলের চাপ থাকায় মামলার চার্জশিট সঠিক সময়ে দেওয়া হয় না। আবার মামলার চার্জশিটের ভুল ব্যাখার কারণেও ভুক্তভোগী নারী ও কন্যা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন।

অন্য সবধরণের অপরাধের বিচারের দীর্ঘসূত্রিতার সঙ্গে তুলনা করে দেখা যায়, নারীদের মামলাগুলোর বিচার হতেই বেশি সময় লাগছে। বিচার যত বিলম্ব, তত সাক্ষীর স্মৃতিভ্রম হয়, প্রমাণ নষ্ট হয়ে যায় বা কেউ মারা যায়। যদিও মামলার রায় দেওয়া হয় তখাপি সেই রায় দ্রুত কার্যকর করা হচ্ছে না। **বিচারহীনতার দিক থেকে নারীরাই সব থেকে বেশি পিছিয়ে আছেন।**

ধর্ষণের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দৃষ্টান্ত নেই বলেই পার পেয়ে যায় ধর্ষকরা। আবার বিলম্বিত বিচার প্রক্রিয়াও সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ধর্ষণকে কোনো অবস্থাতেই লঘু অপরাধ হিসেবে না দেখে জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। তাহলেই কোনো নারী ও কন্যা ধর্ষণের শিকার হওয়ার পর এরজন্য ওই নারীকেই কেউ দায়ী করবে না এবং ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া সম্ভব হবে। নারী ও কন্যার প্রতি ক্রমবর্ধমান সহিংসতা প্রতিরোধে এর কোনো বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সরকারকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। ধর্ষকদের কোনাভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। ক্ষমতাবান বা প্রভাবশালী বলে কোনো ধর্ষক যেন পার পাওয়ার সুযোগ না পায়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

ধর্ষণের ঘটনায় কোনো সালিশ বা মীমাংসা হতে পারে না। এটি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তারপরও আমাদের সমাজে ধর্ষণের ঘটনায় সালিশ ব্যবস্থা বা সামাজিকভাবে মীমাংসা করতে দেখা যায়। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ ধরণের

সালিশে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার চেয়ে ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হয় বেশি। কখনও ধর্ষকের সাথে নির্যাতনের শিকার নারী বা কন্যার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। টাকার মাধ্যমে বিষয়টি মীমাংসা করা এবং স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের প্রভাবে মামলা না করার জন্য ভিকটিমের পরিবারকে জোর করা হয়। অন্যদিকে, নারী ও মানবাধিকার সংগঠন, প্রশাসন ও স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে স্থানীয়ভাবে নানা ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হয়, যেমন–এলাকায় সমাবেশ করা, বৈঠক বসানো, থানায় রিপোর্ট করা, অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের, অনেক ক্ষেত্রে ধর্ষণকারীকে ধরিয়ে দেয়া ইত্যাদি। যদিও এ ধরণের পদক্ষেপ একেবারেই ন্যূনতম সংখ্যক, তারপরও বলা যায় এ ধরনের পদক্ষেপ নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সমাজে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করবে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে, ধর্ষণের শিকার নারী, স্থানীয় জনগণ ও অভিভাবকদের মধ্যেও সচেতনতা বাড়ছে।

যে কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীর আত্মীয়-স্বজন বা অভিভাবক এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অভিযুক্তকে প্রশ্রয় দিলে পুনরায় অপরাধ করার সাহস পায়। কিন্তু শাসন করলে বা প্রশ্রয় না দিলে অভিযুক্ত আর সাহস পায় না। ধর্ষণের ক্ষেত্রেও সামাজিকীকরণের ভূমিকা আছে। জন্মের পর থেকেই পরিবার, স্কুল কিংবা বৃহৎ সামাজিক কাঠামোতে নারীর এবং পুরুষের আলাদা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া জড়িত। সামাজিকীকরণের ভিন্নতার কারণে নারী ও পুরুষের মর্যাদা বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গিও ভিন্নভাবে গড়ে ওঠে। নারীকে যেখানে অধস্তন করে গড়ে তোলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে, সেখানে পুরুষকে গড়ে তোলা হয় বীরপুরুষ রূপে। ফলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষেরা বড় হয়ে ক্ষমতা কাঠামোর কেন্দ্র হয়ে ওঠেন। আর এই আধিপত্যবাদী মানসিকতার কারণে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বাড়তে থাকে। এই ক্রমবর্ধমান সহিংসতার কারণে আমরা যতটা নারী ও কন্যাদের নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হচ্ছি ঠিক ততটাই ভাবতে হবে পরিবারের পুরুষ বা ছেলে সন্তানকে নিয়ে। কেননা, পরিবার হতে প্রাপ্ত নৈতিক মূল্যবোধ ও নারীর প্রতি সম্মান দেওয়া সর্বোপরি জেন্ডার সংবেদনশীলতার শিক্ষাই পারে নারী ও কন্যার প্রতি সহিসংতা প্রতিরোধ করতে এবং নারীর প্রতি অধস্তনতামূলক প্রথা ভেঙ্গে নারী-পুরুষের সমমর্যাদা ও সমতাভিত্তিক সমাজ তৈরি করতে।

চতুর্থ অধ্যায়

উপসংহার

সামাজিক জীবনে ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা প্রতিনিয়ত উপেক্ষিত হচ্ছে। প্রতিদিনই খবরের কাগজে নারী বা কন্যাশিশু নির্যাতন বা ধর্ষণের খবর দেখা যাচ্ছে– যা ভয়াবহ ও উদ্বেগজনক। কন্যাকে স্কুলে পাঠানোর সময় তাকে নিয়ে ভাবতে হচ্ছে, বাড়ি ফিরে না আসা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। কর্মজীবী যে নারী বাইরে যাচ্ছেন, তাঁর চলাফেরাও নিরাপদ নয়। কর্মস্থলের বৈরী পরিস্থিতি বা পরিবারের আপত্তির কারণে অনেককেই ক্যারিয়ার বিসর্জন দিতে হয়। এমনকি ঘরও নিরাপদ নয়। ঘরে-বাইরে সর্বত্র নারী ও কন্যা অনিরাপদ ও সহিংসতার শিকার হচ্ছে। এই ক্রমবর্ধমান সহিংসতা প্রতিরোধ একটি বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে, যা আমাদের সামগ্রিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করবে।

নারীর প্রতি নেতিবাচক ধ্যানধারণা পাল্টিয়ে ইতিবাচক ধারণা সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করা গেলে তাদের প্রতি বৈষম্য কমবে। শিক্ষা দিয়েই এ পরিবর্তন আনা সম্ভব। এ শিক্ষাটা হতে হবে পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক। পারিবারিক ক্ষেত্রে মা-বাবার ভূমিকাই মুখ্য। একজন সন্তান যদি তার মা-বাবার মধ্যে বিভেদ না দেখে নারী-পুরুষ হিসেবে, তাহলে ওই সন্তান বড় হওয়ার পর তার মনে নারী-পুরুষ হিসেবে মর্যাদা বা অধিকারের জায়গায় বিভেদ আনতে পারবে না।

তাই শুরুটা পরিবার থেকেই করতে হবে। ধর্ষণ রোধে প্রতিটি পরিবার থেকে প্রতিটি শিশুকে ছোটবেলা থেকেই নৈতিক শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কারণ পরিবারই হল প্রথম শিক্ষাক্ষেত্র যেখানে শিশুর আচরণ, মূল্যবোধ, নৈতিকতা ইত্যাদির ভিত্তি তৈরি হয়। কন্যাদেরকে 'ভালো স্পর্শ', 'খারাপ স্পর্শ'–এই বিষয়গুলো শেখানো দরকার। পাশাপাশি, পরিবারের ছেলেশিশুদের ছোটবেলা থেকেই নারীর মর্যাদা ও অধিকার সর্বোপরি নারীর প্রতি সম্মান দেখানোর শিক্ষা দেওয়া উচিত। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে এ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ও পাঠ্যক্রমে জেন্ডার সংবেদনশীলতার দিকে নজর দিতে হবে।

নারীর প্রতি সংবেদনশীলতা ও সমাজের সর্বস্তরে শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে হবে। এর অভাব প্রকট বলেই নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সহিংসতাকে রুখতে হলে প্রয়োজন নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা ও সমতাভিত্তিক সমাজ। যার জন্য প্রয়োজন মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন ও সমতাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী। এটি ক্রমে সমাজ-রাষ্ট্রের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। যেখানে জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নারী-পুরুষ মানুষ হিসেবে বিবেচিত হবে। গড়ে উঠবে সমতার প্রজন্ম, থাকবে না কোনো বিভাজন।

সুপারিশসমূহ

- নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি যৌন নিপীড়নসহ সকল প্রকার সহিংসতা ও নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।
- পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে পুত্র ও কন্যার সমঅধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- পরিবারগুলোকে নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতন প্রতিরোধের দুর্গ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
- নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যাশিশুদের পাশে প্রয়োজনীয় সব রকম সহযোগিতা নিয়ে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে দাঁড়াতে হবে।
- নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি নির্যাতনকারীকে রাজনৈতিক-পারিবারিক-সামাজিক ও প্রশাসনিক আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়া বন্ধ করতে হবে।
- উত্ত্যক্তকরণ, যৌনহয়রানি ও নিপীড়নরোধে মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের আলোকে পৃথক আইন প্রণয়ন করতে হবে।
- বিচার কাজের সাথে যুক্ত সম্মানিত বিচারকবৃন্দ ও আইনজীবীদের প্রশিক্ষণ সূচিতে নারীর মানবাধিকারের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতন বন্ধে যে আইনগুলো রয়েছে সেই আইনগুলো সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসন থেকে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- পারিবারিক সুরক্ষামূলক আইনসহ নারীর প্রতি সংবেদনশীল আইনসমূহ গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করতে হবে।
- জাতিসংঘ সিডও সনদের অনুচ্ছেদ-২ ও ১৬(১)(গ)-এর উপর হতে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে এই সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে নারী-পুরুষের সমতা ধারণা, নারীর মানবাধিকার ইস্যুসমূহ সমন্বিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার (VSC) এবং ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (OCC)–এর কার্যক্রম দেশব্যাপী আরও বিস্তৃত করতে হবে।
- সুনির্দিষ্ট আইনের মাধ্যমে মেডিকো-লিগ্যাল পরীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
- বিচার বিভাগের স্বাধানীতা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে।
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে।
- নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতনের ঘটনায় দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি গণমাধ্যমে প্রচার করতে হবে।
- স্বাক্ষীর সুরক্ষা আইন জরুরীভিত্তিতে করতে হবে।
- নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতারোধে দেশের তরুণ-যুবসমাজকে সচেতন, বলিষ্ঠ ও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।
- ধর্ষণের বিচার আইনের সংস্কার করতে হবে। ঘটনার শিকার নারী ও কন্যাশিশুর পরিবর্তে অভিযুক্ত/ অপরাধীকে প্রমাণ করতে হবে সে ঘটনা ঘটায়নি–এই মর্মে প্রচলিত আইনের বিধান সংশোধন করতে হবে।

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন ও উত্ত্যক্তকরণ বন্ধে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।
- জেলা পর্যায়ে ফরেনসিক মেডেসিন বিভাগে নারী চিকিসৎক দিতে হবে যাতে ধর্ষণের শিকার নারী ও শিশুর মেডিকেল পরীক্ষা নিশ্চিত করতে পারে।
- তরুণসমাজ ও পুরুষসহ সাধারণ জনগণের মাঝে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও নির্মূল বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করতে হবে।
- তরুণসমাজকে ভয়াবহ নেশার আগ্রাসন থেকে মুক্ত করতে হবে। তরুণদের মাঝে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বাড়াতে হবে।
- রাজনৈতিক দলের সংস্কৃতি পরিবর্তন করতে হবে এবং নারীবান্ধব করতে হবে।
- আইন প্রয়োগকারী বাহিনী বা পুলিশকে জেন্ডার সংবেদনশীল হতে হবে।
- নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ সহায়ক ও পর্যবেক্ষক কমিটি শহর, গ্রাম ও এলাকাভিত্তিক হতে পারে।
- নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতনের মামলা বিশেষ করে ধর্ষণ, গণধর্ষণের মামলা দ্রুত এবং সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতির মাধ্যমে বিচার নিশ্চিত করতে হবে।
- ডিএনএ টেস্ট নিশ্চিত করতে হবে এবং এর খরচ রাষ্ট্রকে বহন করতে হবে।
- ২৪ ঘন্টা হেল্প লাইনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এর প্রচার করতে হবে যাতে নির্যাতনের শিকার নারী খুব সহজে অভিযোগ জানাতে পারে।
- রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীর নির্যাতনের ডাটাবেইজ তৈরি করা ও নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকারের যথোপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে নারী নির্যাতন পরিস্থিতি গবেষণার কাজ বাড়াতে হবে।
- নারী নির্যাতন বিরোধী আইন সম্পর্কে নারীদের জানানো ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা যেন তারা নির্যাতনকে চিহ্নিত করতে পারে ও তার প্রতিরোধে ও প্রতিকারের পদক্ষেপ নিতে পারে।
- গণমাধ্যমের কর্মীদের নির্যাতনের সংজ্ঞাগুলো স্পষ্টভাবে জানা এবং এ সম্পর্কিত প্রতিবেদনগুলো স্পষ্টভাবে ও সঠিক তথ্য দিয়ে প্রকাশ করা এবং রিপোর্টের ফলোআপ করা।
- গণমাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারীর নাম, ঠিকানা ও ছবি দেয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা।

তথ্যপঞ্জি

- *Ending Violence against Women*, Volume xxiv, no 4, December 1999, Series L, number II, and Population Report.
- Sharmeen A. Farouk: *Violence against Women: A statistical overview, challenges and gaps in data collection and methodology and approaches for overcoming them*; 2005.
- Lyn Bates: *Safety for Stalking Victims, How to Save Your Privacy, Your Sanity & Your Life*: iUniverse Press.
- World Health Organization: *Violence against Women, Definition and Scope of the problem*; 1997.
- www.legal-dictionary.thefreedictionary.com/sexual harassment
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ ও ২০০৩।
- পারিবারিক নির্যাতন আইন ২০১০।
- বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ; *বাংলাদেশে নারী নির্যাতন পরিস্থিতি ২০১৩।*